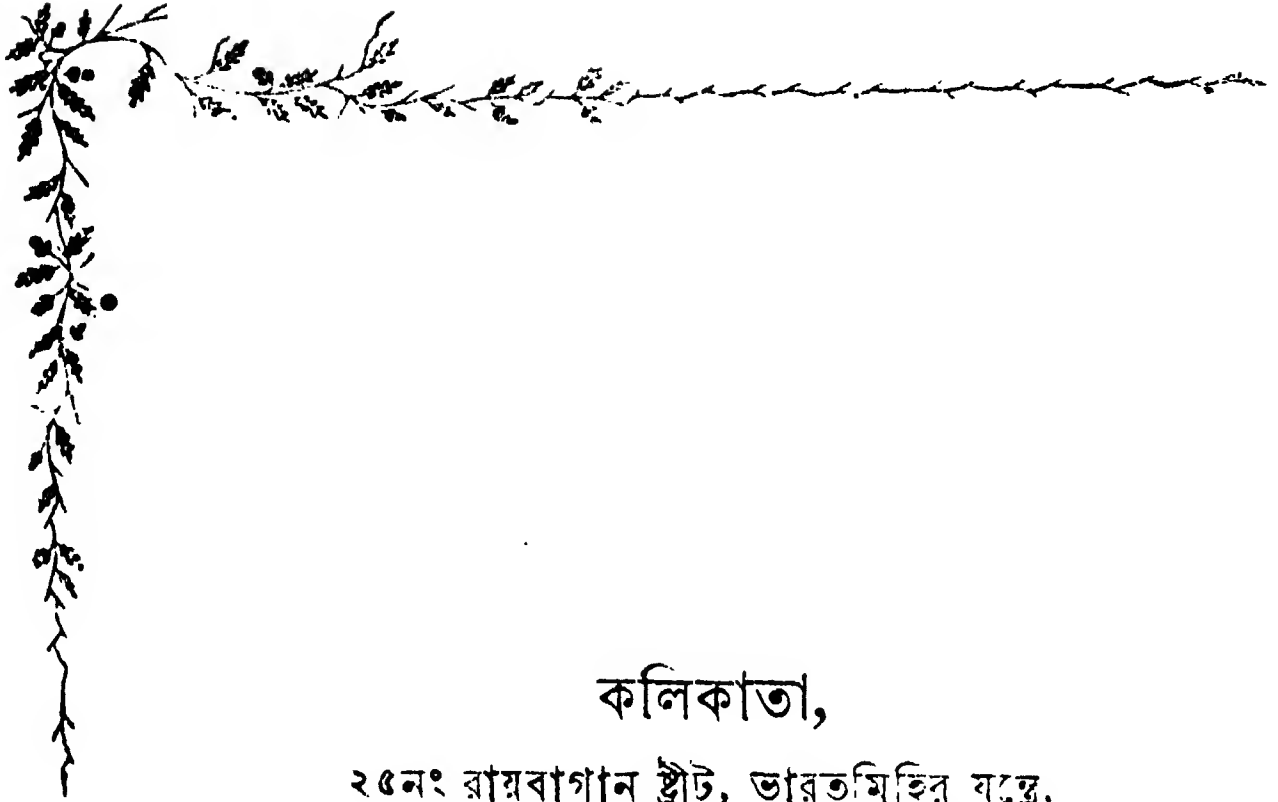


অমৃত।

আম। নবীনচন্দ্র সেন

১৩১৬ আ।

শ্রীনিখিলচন্দ্র



কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির বন্দে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ও

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১৬

নিবেদন ।

আমার পিতৃদেব “প্রভাসের” ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিয়াছিলেন :—

“ফলিয়াছে বহু আশা ; ফলে নাই বহু আর ।”

আজ তাঁহার বড় আদরের “অমৃতভের” মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইল । শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের করুণালীলা দেখিবেন ও দেখাইবেন ইহাই তাঁহার আশা ছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না । তিনি যে একবার মুদ্রিত “অমৃতভ” দেখিয়া গেলেন না আমার এই দুঃখে কোথায় রাখিব ? যাহা হউক “অমৃতভ” অসম্পূর্ণ হইলেও পাঠকবর্গের নিকট পিতার এই শেষ কাব্য প্রীতির বস্তু হইবে এই ভরসায় ইহা প্রকাশিত করিলাম ।

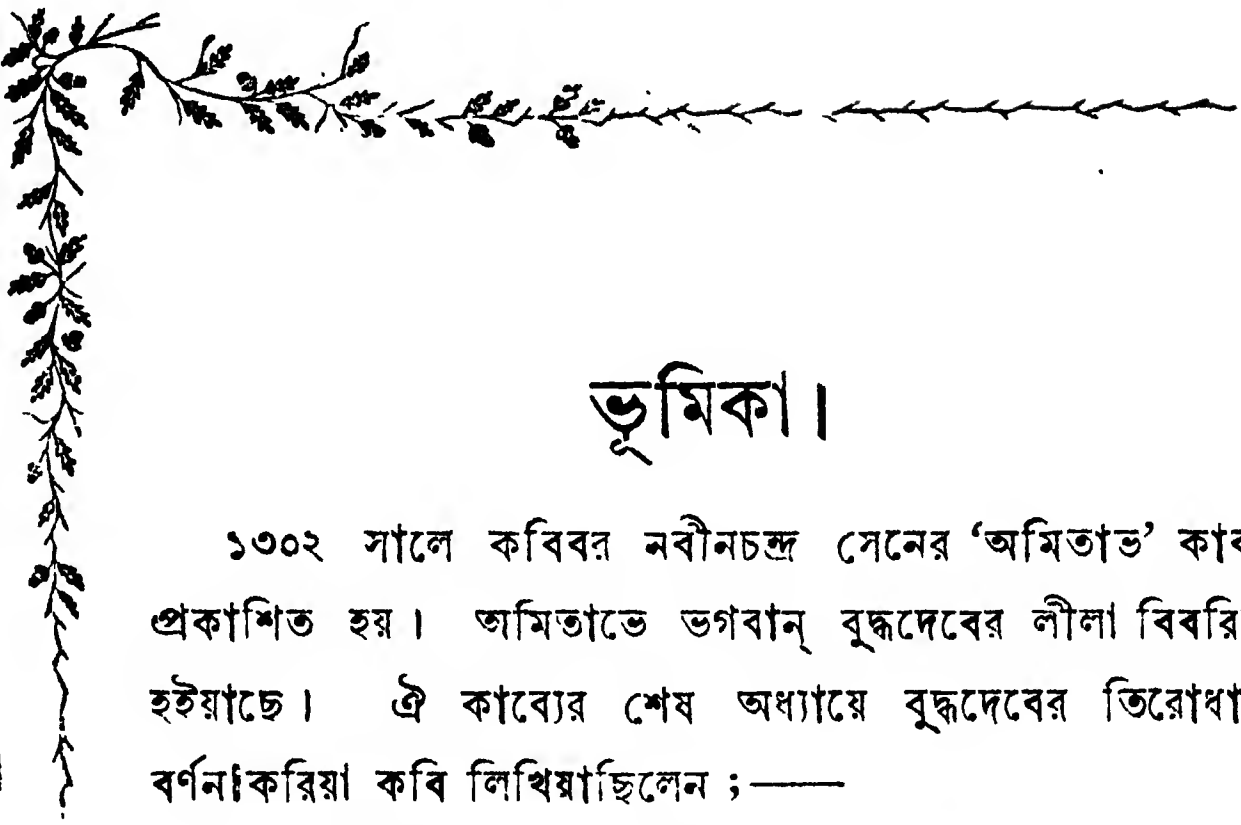
আমার পিতার পরম বন্ধু শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন । তাঁহার নিকট আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তির ঋণ যে কত গভীর তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম ।

পিতার পরম স্নেহভাজন, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমার পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছে :

আবার °

শ্রীনির্মলচন্দ্র সেন ।

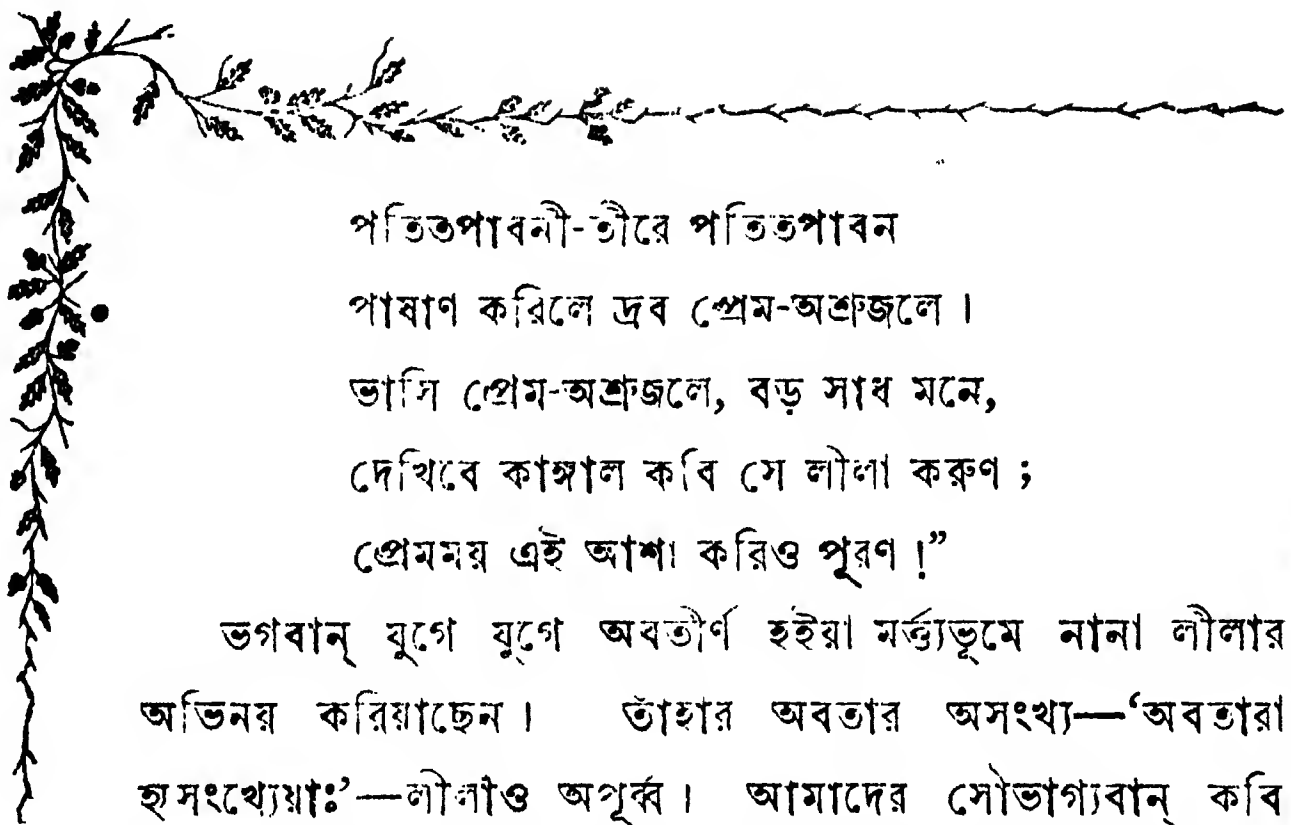
১৯১৫



ভূমিকা ।

১৩০২ সালে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের ‘অমিতাভ’ কাব্য প্রকাশিত হয় । অমিতাভে ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলা বিবরিত হইয়াছে । ঐ কাব্যের শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের তিরোধান বর্ণনাকরিয়া কবি লিখিয়াছিলেন ;—

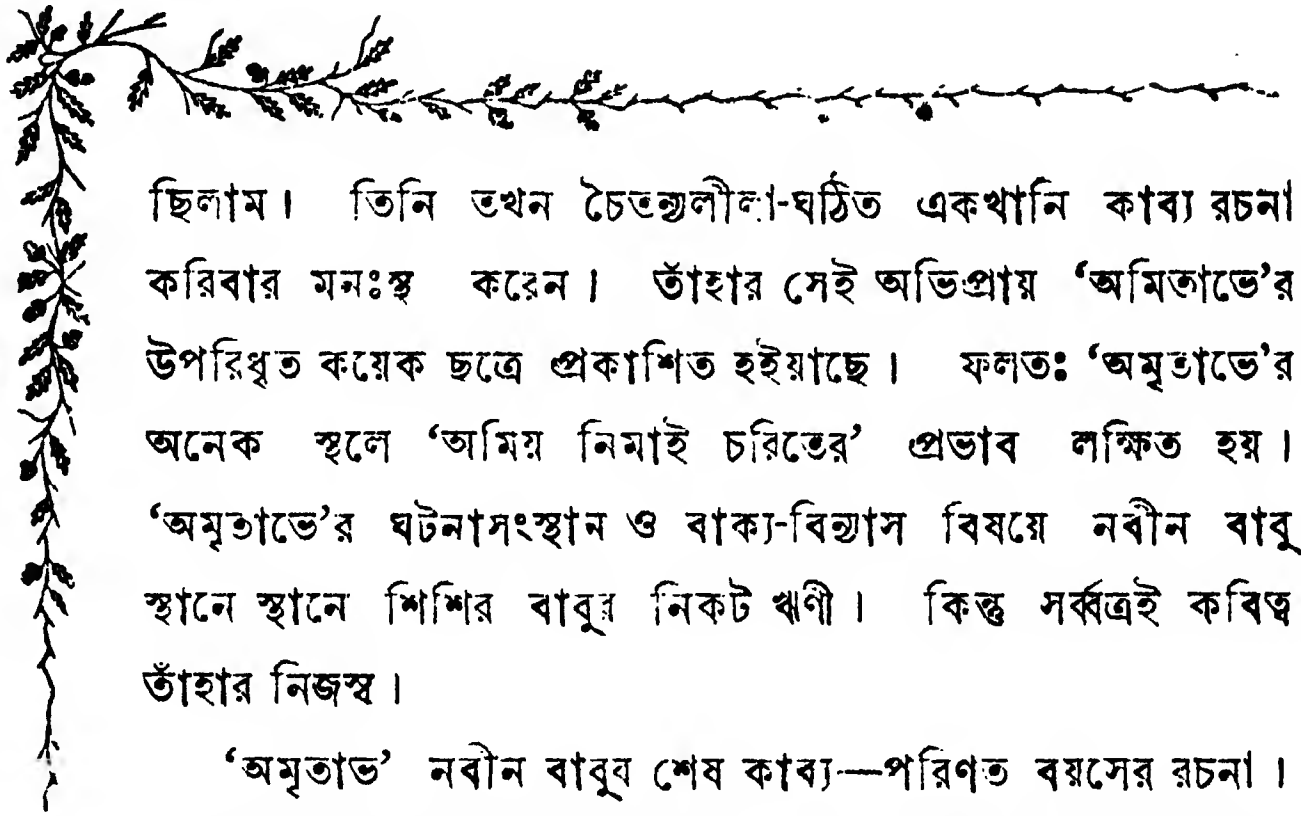
“যাও দেব ! লীলা শেষ । এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর !
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসৰ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী ! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান ।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ধার
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব । আসিয়া আবার



পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে ।
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করণ ;
প্রেমময় এই আশা করিও পূরণ !”

ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্যভূমে নানা লীলার
অভিনয় করিয়াছেন । তাঁহার অবতার অসংখ্য—‘অবতারা
হসংখ্যেয়াঃ’—লীলাও অপূর্ণ । আমাদের সৌভাগ্যবান্ কবি
‘রৈবতক’ ‘কুরুক্ষেত্র’ ও ‘প্রভাসে’ তাঁহার কৃষ্ণলীলার, ‘খৃষ্ট’ কাব্যে
তাঁহার খৃষ্টলীলার এবং ‘অমিতাভে’ তাঁহার বুদ্ধলীলার চিত্র
আঁকিয়া ; চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিবার জন্য আশাবিত হইয়া
উপরোক্ত প্রার্থনাটি লিপিবদ্ধ করেন । ভক্তবৎসল ভক্তের বাঞ্ছা
অপূর্ণ রাখেন নাই । তাহার ফল এই ‘অমৃতভ’ কাব্য । ইহাতে
ভগবানের চৈতন্যলীলা বিবৃত হইয়াছে ।

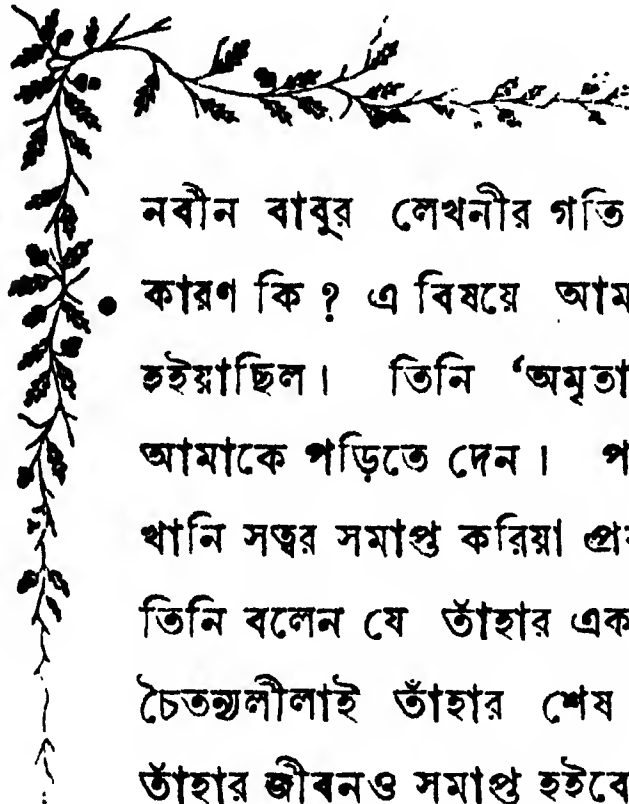
১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের ‘অমিয় নিমাই
চরিত’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে নবীন বাবু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া
চৈতন্যলীলার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন । ‘বিষ্ণুপ্রিয়া’
পত্রিকায় ঐ সময়ে চৈতন্যলীলা বিষয়ক শিশির বাবুর কয়েকটি
মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয় । উহার ফলে সেই আকর্ষণ আরও
বর্দ্ধিত হয় । এ কথা আমি নবীন বাবুর নিজের মুখে শুনিয়া-



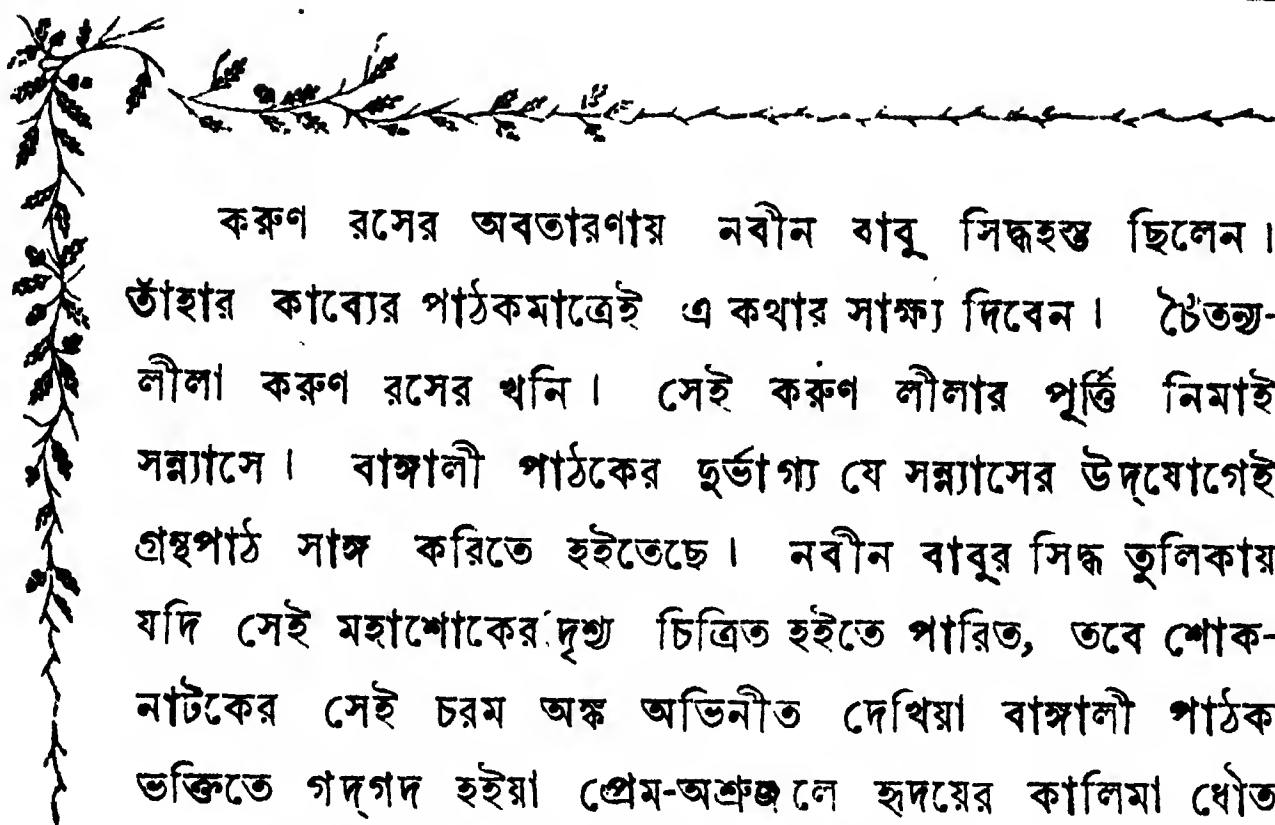
ছিলাম। তিনি তখন চৈতন্যলীলা-ঘটিত একখানি কাব্য রচনা করিবার মনঃস্থ করেন। তাঁহার সেই অভিপ্রায় ‘অমৃতভে’র উপরিধৃত কয়েক ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ ‘অমৃতভে’র অনেক স্থলে ‘অমিয় নিমাই চরিত্তের’ প্রভাব লক্ষিত হয়। ‘অমৃতভে’র ঘটনাসংস্থান ও বাক্য-বিত্তাস বিষয়ে নবীন বাবু স্থানে স্থানে শিশির বাবুর নিকট শ্রী। কিন্তু সর্বত্রই কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব।

‘অমৃতভ’ নবীন বাবুর শেষ কাব্য—পরিণত বয়সের রচনা। কবিশক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। বরং দেখা যায় অনেক স্থলে শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে পরশুরামের বিষ্ণুতেজের ত্রায় বিধাতার দুর্লভ দান কবির এই কবিত্বশক্তি বয়সের সংস্পর্শে তিরোহিত হয়। ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু নবীন বাবুর প্রতি বাগদেবী শেষ অবধি সদয়া ছিলেন। ‘অমৃতভে’র স্থানে স্থানে যে উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তাঁহার কবিত্ব শক্তির এখনও খর্ব্বতা হয় নাই।

‘অমৃতভ’ অসম্পূর্ণ কাব্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইহার ‘আবাহন’ সর্গ রচিত হয়। প্রথম সর্গ ‘অবতরণের’ পাণ্ডুলিপির শেষে কবি নিজ হস্তে লিখিয়াছেন—দোল-পূর্ণিমা ৫।৩।০১। শেষ সর্গের রচনা কাল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। ‘অমৃতভে’র ১২ সর্গের রচনায় প্রায় ৮ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে। অথচ আমরা জানি যে



নবীন বাবুর লেখনীর গতি মন্থর ছিল না। এত কাল-ব্যয়ের কারণ কি? এ বিষয়ে আমার সহিত নবীন বাবুর একবার কথা হইয়াছিল। তিনি ‘অমৃতভে’র প্রথম ৪।৫ সর্গের পাণ্ডুলিপি আমাকে গড়িতে দেন। পড়া শেষ হইলে আমি তাঁহাকে কাব্য খানি সত্ত্বর সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। উত্তরে তিনি বলেন যে তাঁহার এক নিকট আত্মীয়্যার দ্রব ধারণা এই যে চৈতন্যলীলাই তাঁহার শেষ কাব্য; ঐ কাব্য সমাপ্তির সহিত তাঁহার জীবনও সমাপ্ত হইবে। সেই ধারণার অনুরোধে তিনি ধীরে ধীরে কাব্য রচনা করিতেছিলেন। ফলেও দেখা যায় যে যদিও ১৩০২ সালের পূর্বেই ‘অমৃতভ’ রচনার সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল, কিন্তু কাব্য-রচনার সূত্রপাত ১৩০৭ সালে। তাঁহার একমাত্র স্নেহাস্পদ পুত্র নিম্নলিচন্দ্র তখন বিদ্যাভ্যাসের জ্ঞাত বিলাতযাত্রায় সজ্জিত। তাহারই কল্যাণকামনায় তিনি কাব্য-রচনার আরম্ভ করেন। ‘আবাহন’ ও প্রথম ‘অবতরণ’ সর্গের শেষে পুত্রের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা আছে। এইরূপে নিম্নলের নাম গ্রন্থের সঙ্গে চিরদিন জড়িত হইয়া থাকিবে। তাহার প্রবাসযাত্রা না হইলে হয়ত ‘অমৃতভ’ রচিতই হইত না। পুত্র কৃতী হইয়া প্রবাস হইতে ফিরিলে গ্রন্থ-রচনা আবার মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ দুই সর্গ পুত্রের কর্মস্থল রেঙ্গুনে বিরচিত।



করুণ রসের অবতারণায় নবীন বাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের পাঠকমাত্রেই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। ঠেঁতুল-লীলা করুণ রসের খনি। সেই করুণ লীলার পূর্তি নিমাই সন্ন্যাসে। বাঙ্গালী পাঠকের হৃভাগ্য যে সন্ন্যাসের উদ্যোগেই গ্রন্থপাঠ সাক্ষ্য করিতে হইতেছে। নবীন বাবুর সিদ্ধ তুলিকায় যদি সেই মহাশোকের দৃশ্য চিত্রিত হইতে পারিত, তবে শোক-নাটকের সেই চরম অঙ্ক অভিনীত দেখিয়া বাঙ্গালী পাঠক ভক্তিতে গদগদ হইয়া প্রেম-অশ্রুজলে হৃদয়ের কালিমা ধৌত করিবার অবসর পাইত। কিন্তু তাহা হইল না!

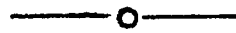
অগ্রহায়ণ
১৩১৬ সাল, }

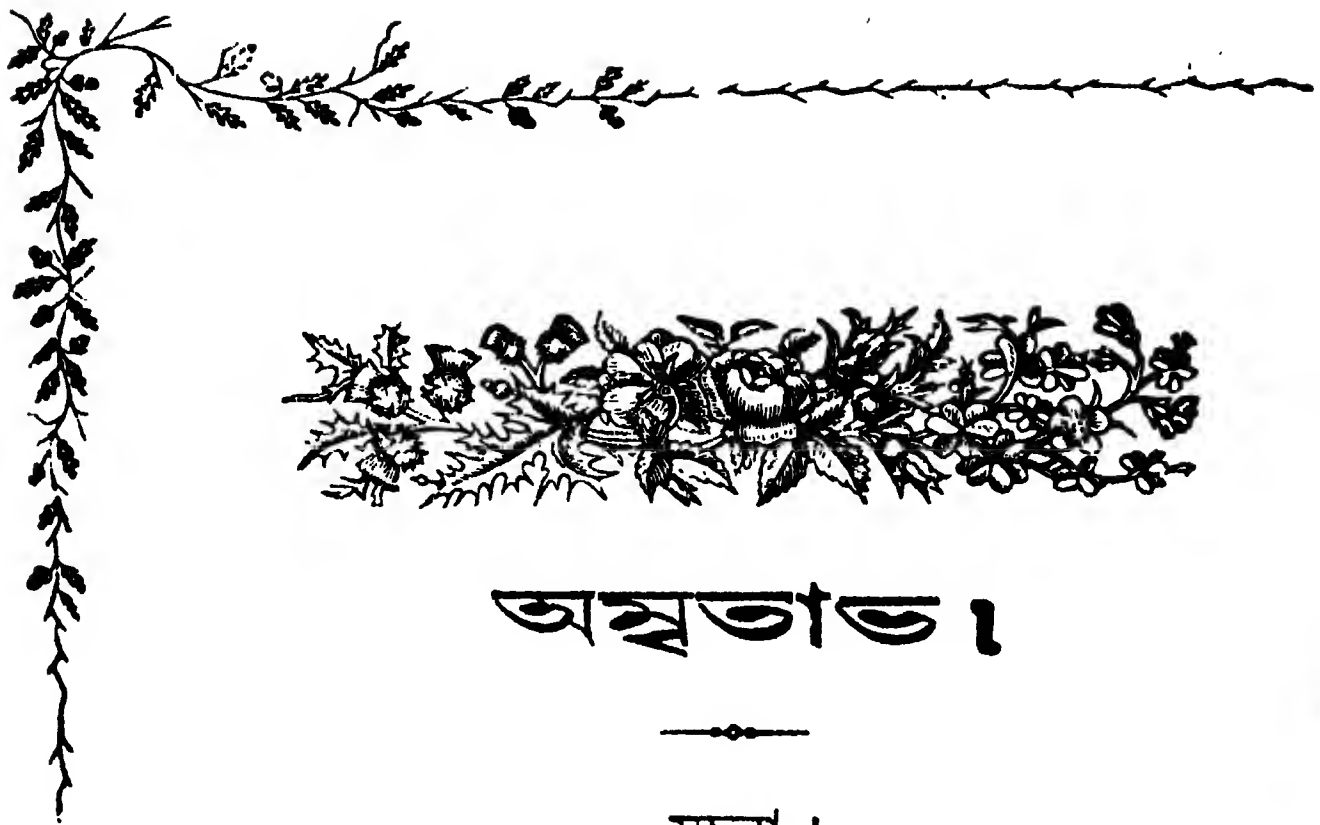
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।



সূচীপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈকুণ্ঠ—আবাহন	২
প্রথম সর্গ—অবতরণ	১১
দ্বিতীয় সর্গ—শৈশব লীলা	২০
তৃতীয় সর্গ—বিশ্বরূপ	৩৫
চতুর্থ সর্গ—উপনয়ন	৪৬
পঞ্চম সর্গ—চঞ্চল পণ্ডিত	৫৭
ষষ্ঠ সর্গ—পূর্বরাগ	৭৯
সপ্তম সর্গ—মহাপ্রকাশ	৯৮
অষ্টম সর্গ—ভাবাবেশ	১১৯
নবম সর্গ—পাষণ্ড	১৪৬
দশম সর্গ—পতিতোদ্ধার... ..	১৬৭
একাদশ সর্গ—সন্ন্যাস সঙ্কল্প	১৯৫
দ্বাদশ সর্গ—বিদায়	২১৭





অমৃতাত ।

সূচনা ।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্মের ত্রিবেণী—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তিদারা—মানব জীবনের প্রভাত হইতে ধীরে ধীরে পুণ্যলোক জগদগুরু ঋষিদিগের মুখে প্রবাহিত হইতেছিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বরিক সম্পদে পঞ্চসহস্রবর্ষ পূর্বে সেই জ্ঞানের সরস্বতী, ভক্তির যমুনা এবং কর্মের ভাগীরথী সংস্কৃত ও সম্মিলিত করিয়া ভারতীয় বা জাগতীয় ধর্মের মহাপ্রয়াগতীর্থে নবধর্ম স্থাপন করিয়া যান । কালে সেই ভাগীরথী পঙ্কিল হইয়া উঠিলে শ্রীবুদ্ধদেব সার্ক দুই সহস্র বৎসর পূর্বে তাঁহার কর্মধারার এবং শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য অনুমান ১২০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জ্ঞানধারার সংস্কার ও বিস্তার সাধন করেন । কিন্তু বুদ্ধদেবের কর্মবাদে এবং শঙ্করাচার্য্যের সোহং বাদে ভক্তিদারা বিলুপ্তপ্রায় হয় । সোহং—

অর্থাৎ আমিই তিনি—অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম এক, তিনি ও আমি—অভিন্ন । তাহা হইলে জীব আর কাহাকে ভক্তি করিবে ? অমুমান ৯০০ বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ এবং তাঁহার বার্কিকা সময়ে মাধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত জ্ঞান ও কর্মমূলক ভক্তিধর্ম পুনর্জীবিত করেন । মাধ্বাচার্য্যের পঞ্চদশতম প্রধান শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্যটন করিয়া এই ধর্ম প্রচার করেন । তিনিই নবদ্বীপের শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যকে এই ধর্মে দীক্ষিত ও একটি ভক্তিসভা স্থাপিত করিয়া নবদ্বীপে শুদ্ধ তায়শাস্ত্রের মরুভূমিতে ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিত করেন । এই দীক্ষা হইতে কমলাক্ষ অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন । ভক্তেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইয়া তালি দিয়া নাম কীর্তন করিতেন । পণ্ডিতেরা তাহাদের উপর শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতেন । এই বিদ্বেষ-বিক্র অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণ হা কৃষ্ণ ! বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন । তিনি সেই কাতর আবাহন শ্রবণ করিয়া ৪০০ বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে অমৃতভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-ভাগীরথীর প্রবল বহ্যায় এই বঙ্গদেশ প্রাবিত করিয়াছিলেন । তাঁহার সেই প্রেমের বিন্দুমাত্রের জন্ত পিপাসায় আকুল হইয়া আমি এই ‘অমৃতভ’ প্রণয়ন করিলাম ।





— श्री श्री गुरु —



অমৃতভ ।

বৈকুণ্ঠ ।

আবাহন ।

“গোপীমোহন ! রাজরাজেশ্বরী—

রাধিকা রজন ! আয়রে আয় !”—

কি মধুর গীত ! কিবা মধুরা যামিনী

শত পূর্ণ চন্দ্রোজ্জ্বলা সুধা-সঞ্চারিণী,

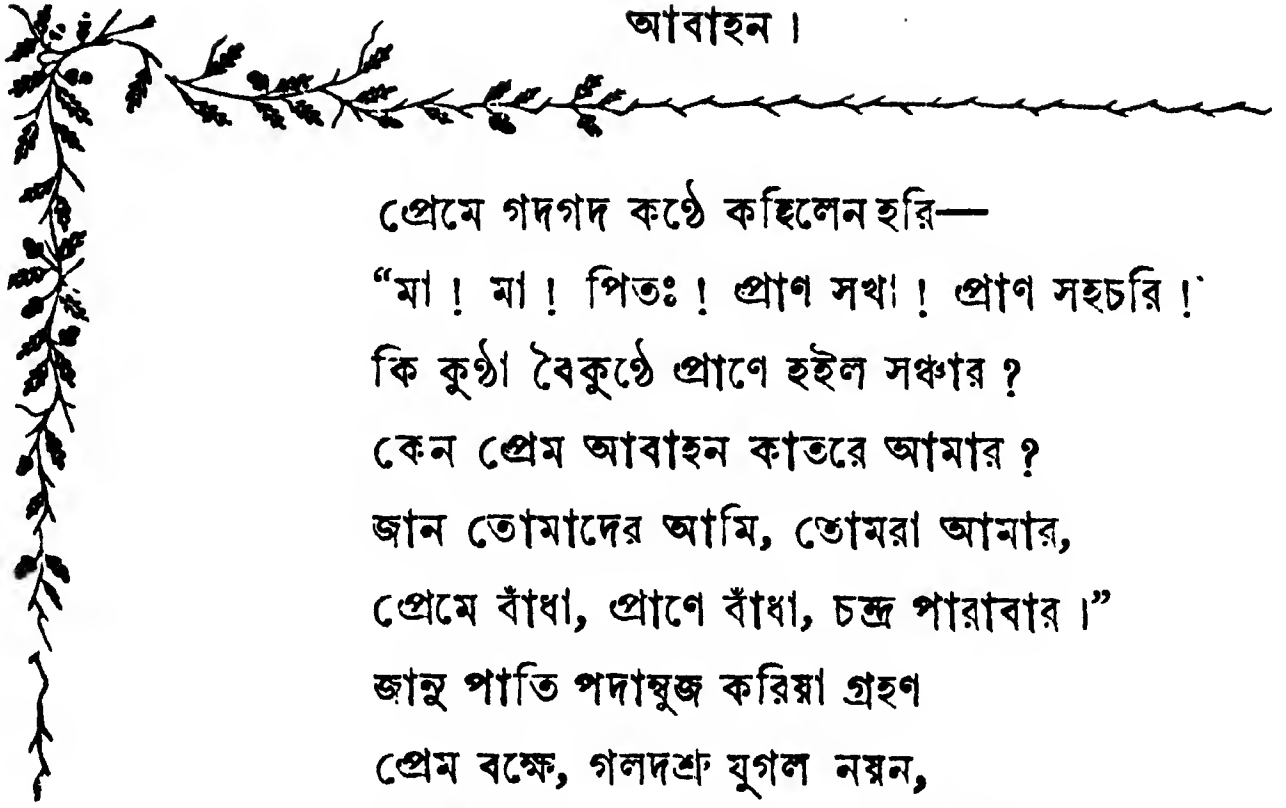
হাসিছে ত্রিদিব কুঞ্জে, ত্রিদিব সমীরে,

অমৃত বাহিনী চারু তটিনীর তীরে ।

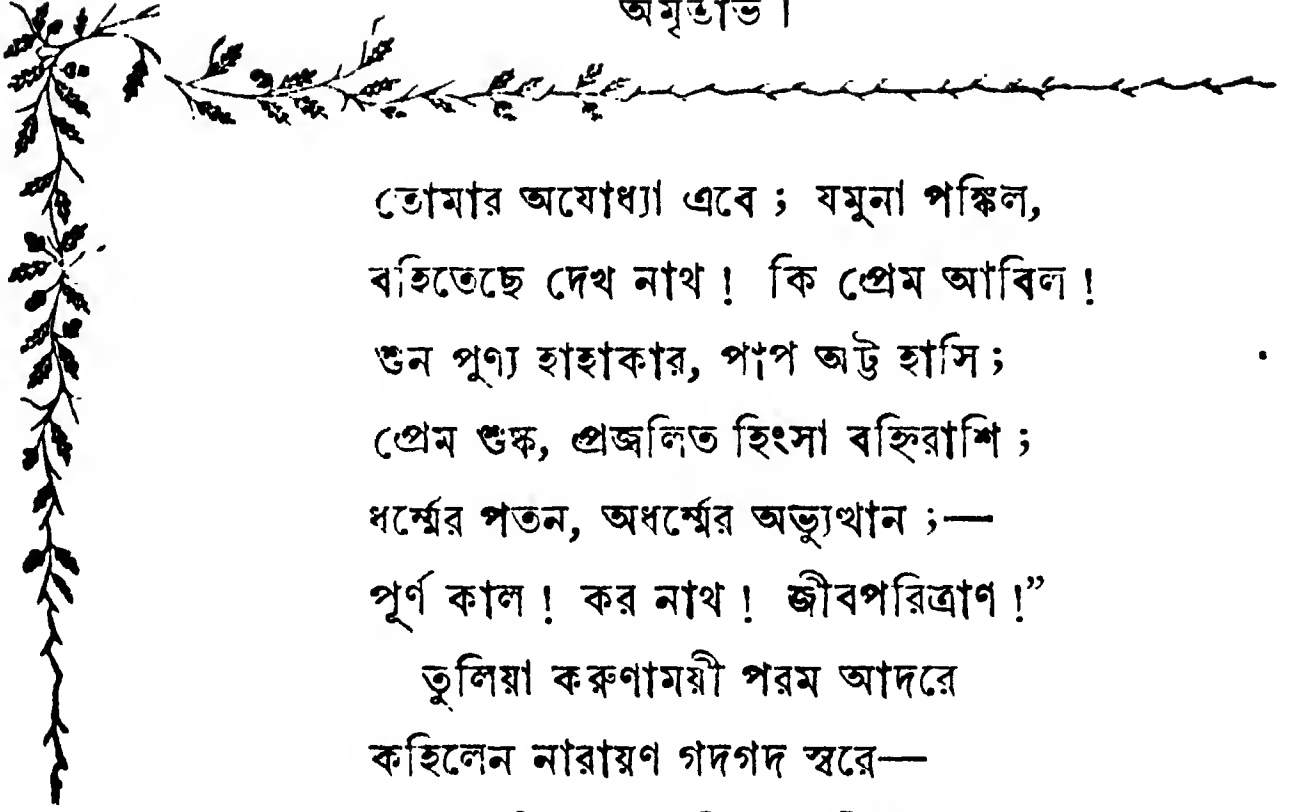
একবার ব্রজাঙ্গনা করিতেছে গান,

তুলি কর লীলা পদ্য ; প্রেমমুগ্ধ প্রাণ,

কি মধুর গীত ! কিবা প্রেম আবাহন !
 জগত-মঙ্গল গীত, সুধাপ্রসবণ !
 যুগে যুগে বৈকুণ্ঠেতে উঠে এই গীত
 উদ্ধারিতে পাপিগণে, জুড়াতে তাপিত ।
 এইরূপে বিষ্ণুপদে লভিয়া জনম
 প্রেম প্রবাহিণী করে পতিত পাবন ।
 না হি কুরাইতে গীত, জ্যোৎস্না বিভাসি
 কিবা নীলমণি আভা মহিমার হাসি
 উঠিল ভাসিয়া ! ধীরে যুথিকা সাগরে
 ভাসিল নীলাজ মূর্তি গীতের সুস্বরে ।
 ভাসিল রাগিণী যথা সুস্বরে বীণার,
 ভাসিয়া উঠিল যথা ভাব কবিতার ।
 শিরে শিখিচুড়া, অঙ্গে পীত ধড়াস্বর,
 অধরে মুরলী, অঙ্গ ত্রিভঙ্গ সুন্দর,
 গলে বনমালা, অঙ্গে অঙ্গে বনদাম ।
 পূর্ণ গীত ! পতিতের পূর্ণ মনস্কাম !
 যশোদার নীলমণি নন্দ-নন্দলাল,
 ব্রজের রাখাল দেখে গোষ্ঠের গোপাল ।
 ব্রজের কিশোরী দেখে ব্রজের কিশোর,
 আকর্ণ নীলাজ নেত্র প্রেমেতে বিভোর !



প্রেমে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন হরি—
 “মা ! মা ! পিতঃ ! প্রাণ সখা ! প্রাণ সহচরি !
 কি কুণ্ঠা বৈকুণ্ঠে প্রাণে হইল সঞ্চার ?
 কেন প্রেম আবাহন কাতরে আমার ?
 জান তোমাদের আমি, তোমরা আমার,
 প্রেমে বাঁধা, প্রাণে বাঁধা, চন্দ্র পারাবার ।”
 জানু পাতি পদাঘুজ করিয়া গ্রহণ
 প্রেম বক্ষে, গলদণ্ড যুগল নয়ন,
 কহিলা কিশোরী প্রেম উচ্ছ্বসিত প্রাণে—
 “চেয়ে দেখ প্রাণনাথ ! পৃথিবীর পানে !
 দেখ ভারতের পানে !—তব লীলা ভূমি !
 ধর্মের উদয় ভূমি ! যেই থানে তুমি
 যুগে যুগে নর জন্ম করিয়া গ্রহণ
 দেখাইলা নরচক্ষে নর-নারায়ণ ।
 সত্য যুগে পুণ্যবতী সরস্বতীতীরে ;
 ত্রেতায় সরযুতীরে ; যমুনার নীরে
 দ্বাপরে বহিল প্রেম লীলা নিরমল ;
 কলিতে কপিলবস্তু হইল উজ্জল ।
 তিরোহিতা সরস্বতী ; শুষ্ক সরযুর
 বহে ক্ষীণা বারিরেখা ; স্বপন সূদূর



তোমার অযোধ্যা এবে ; যমুনা পঙ্কিল,
বহিতেছে দেখ নাথ ! কি প্রেম আবিল !
শুন পুণ্য হাহাকার, পাপ অটু হাসি ;
প্রেম গুহ, প্রজ্বলিত হিংসা বহিরাশি ;
ধর্মের পতন, অধর্মের অভ্যুত্থান ;—
পূর্ণ কাল ! কর নাথ ! জীবপরিত্রাণ !”

তুলিয়া করুণাময়ী পরম আদরে
কহিলেন নারায়ণ গদগদ স্বরে—
“প্রেমময়ি ! আরাধিকা রাধিকা আমার !
কাঁদে প্রাণ যুগে যুগে এক্রপে তোমার
মানবের মহা দুঃখে । করুণা উচ্ছৃত
নব ধর্ম ভাগীরথী হয় প্রবাহিত
যুগে যুগে ; করুণার এই আকর্ষণে
লভি জন্ম যুগে যুগে তব আবাহনে ।
লুপ্ত সরস্বতী ; শীর্ণা সরযু আবিল ;
লুপ্ত বৃন্দাবন ; বহে যমুনা পঙ্কিল ।
বেদের সরল ধর্ম মানব শৈশবে
শিখাইলু, দেখাইলু কৈশোরে মানবে
ত্রেতায পবিত্র করি সরযুর তীর,
আদর্শ নরের রাম, সীতা রমণীর ।

করাল কাগনা মেঘ মানব যোবনে
 ভাসিল কি যোরতর অদৃষ্ট-গগনে !
 কি হিংসার বিছাতাগ্নি, দাবাগ্নি সমান,
 জালিল ভারত বক্ষে কি মহা শ্মশান ।
 অবতরি বমুনীর তীরে সুশীতল,
 এ মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে স্থির, অবিচল,
 দেখাইলু ব্রজ-প্রেম কামনা রহিত ।
 শিখাইলু কৰ্ম ফল-কামনা-বর্জিত ।
 কিশোরের কিশোরীর হৃদয় কোমল,
 প্রেমের উর্বর ক্ষেত্র পবিত্র নিৰ্ম্মল ।
 নাহি তাহে স্বার্থ ছায়া, আসক্তির বন,
 কিশোর-হৃদয় স্বচ্ছ নিৰ্ম্মল দৰ্পণ ।
 সেই ক্ষেত্রে প্রেম বীজ করিলু রোপণ,
 জন্মিল কি মহীৰুহ ব্যাপি বৃন্দাবন,
 বাপিয়া ভারত, ছায়া জুড়াইল ধরা,
 ফলে পুরাইল নর পিপাসা প্রথরা ।
 শাস্ত ও বাৎসল্য, দাত্ত, সখ্য, ও মধুর,
 প্রেমাসবে জুড়াইল নর তৃষ্ণাতুর ।
 সেই প্রেম, সেই কৰ্ম, ভুলিল মানব ;
 আবার হইল ধরা দুঃখের অর্ণব,

কামনার অগ্নি পূর্ণ । কাঁদিল পরাণ
শিখাইলু করুণার কামনা নিব্বাণ ।

রাজপুত্র সাজি যোগী মূর্তি করুণার,
অহিংসা পরমধর্ম করিলু প্রচার ।

কি বিষেতে পরিণত ব্রজলীলামৃত !

ফল কামনায় নর আবার দাহিত ।
ভুলেছে মানব সেই রাস, গোচারণ,
ভুলেছে সে ব্রজপ্রেম, ভক্তির চরম ।

রমণীর আকর্ষণে এ প্রেম শীতল
হইয়াছে কলুষিত তীব্র হলাহল ।
একদিকে বৈরাগীর প্রেম কলুষিত,
তান্ত্রিকের বামাচার কলুষ পূরিত ।

অন্য দিকে মায়াবাদ গুপ্ত মরুময়,
করিয়াছে প্রেমহীন মানবহৃদয় ।

অবতারি এইবার জাহ্নবীর তীরে,
ভাসাইব ধরাতল প্রেম অশ্রু নীরে ।
কাঁদাইলু দ্বাপরেতে ; কাঁদিব এবার ;
দুই নেত্রে প্রেম-গঙ্গা বহিবে আমার ।
দ্বাপরেতে অমুরাগী, বৈরাগী এবার ;
রমণী পাবে না ছায়া ছুঁইতে আমার ।

বাঁশী ছাড়ি নিব দণ্ড, কমণ্ডলু আর,
 দ্বাপরে ঐশ্বর্য লীলা, দারিদ্র্য এবার !
 মম আত্মা, তব অঙ্গ করিয়া গ্রহণ,
 দেখাইব, প্রিয়তমে ! যুগলমিলন ।
 একাধারে ব্রজপ্রেম করি অভিনয়,
 দেখাইব, ব্রজলীলা কামক্রীড়া নয় ।
 নন্দ যশোদার ভাবে হইয়া বিহ্বল
 কখনও বাৎসল্য প্রেমে কাঁদিব কেবল ।
 ব্রজের রাখাল ভাবে বিভোর কখন,
 দেখাইব সখ্য দাস্য মধুর কেমন ।
 কভু ব্রজাঙ্গনা ভাবে হইয়া বিভোর,
 আপনি আপনা তরে কাঁদিব অঝোর ।
 আপনার ভাবে কভু বিভোর আবার,
 কাঁদিব তোমার তরে করি হাহাকার ।
 বুঝাইব ব্রজলীলা, ভাবেতে অধীর,
 প্রকৃতির পুরুষের প্রেম স্নগভীর ।
 তোমরা লভিবে জন্ম যথা রুচি যার
 হরে কৃষ্ণ—এই বার গৌর অবতার ।”
 বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর বুকে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী
 লইলেন, ছুটিল কি প্রেমের লহরী !

হইল যুগল এক অঙ্গে পরিণত
সলিলে সলিল, দীপে দীপশিখা মত ।
কিবা গৌর-হরি রূপ ! নেত্রে প্রেমধারা,
করে দণ্ড কমণ্ডলু, প্রেমে আত্মহারা !
গাহিল গোলকবাসী—“হরি হরি বোল ।”
উঠিল ত্রিলোক ব্যাপি হরি নাম রোল ।
সে নাম লীলা তরঙ্গে, বিশ্ব আলো করি
অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন হরি ।

এস নাথ ! এস ওই মনোহর বেশে
নবীনের হৃদয়েতে ! যায় দূর দেশে
আমার নিম্মল শিশু কাতর অন্তরে,
শিক্ষাকাজক্ষী সার্কি হুই বৎসরের তরে ।
তাহার দ্বিতীয় নাই, তার শূন্য স্থান
করিবে পূরণ নাথ ! জুড়াইবে প্রাণ ।
তার রূপে, তার স্থান, করিয়া গ্রহণ,
নিবারিও হৃদয়ের রক্ত প্রস্রবণ ।
রাখিও বিদেশে তারে শ্রী-অঙ্গে তোমার !—
গাইব তোমার লীলা, প্রেম পারাবার !
জুড়াইতে এই দীর্ঘ বিরহ দাহন,
এস বক্ষে, পাতিয়াছি কমল আসন ।

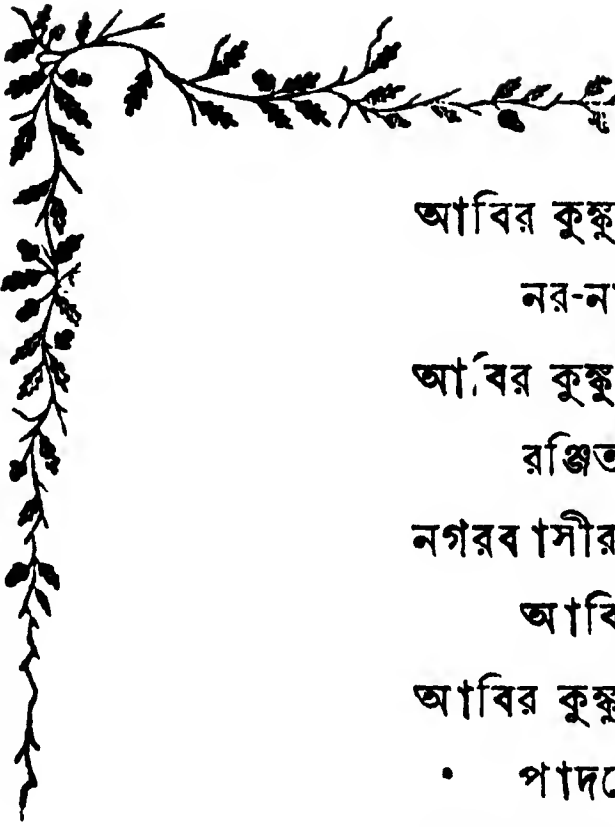


অমৃতাত ।

প্রথম সর্গ ।

অবতরণ ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা স্নানীতল,
ছাইয়া জাহ্নবীনীৰ,
শোভে নবদ্বীপে, শান্তি স্বরূপিণী,
ছাটয়া জাহ্নবীতীর ।
বসন্ত উৎসবে পুণ্য নবদ্বীপ,
সারাদিন মাতোয়ারা ।
শত শত দোলে ছলিছে গোবিন্দ ;
হৃদয়ে আনন্দ ধারা
নগরবাসীর বহিছে উছলি,
জাহ্নবীর ধারা মত ;



আবির কুসুমের রঞ্জিত নগর ;
নর-নারী ক্রীড়ারত ।
আবির কুসুমের রঞ্জিত সৈকত,
রঞ্জিত জাহ্নবী-জল,
নগরবাসীর হৃদয় আনন্দে
আবির কুসুমোজ্জ্বল ।
আবির কুসুমের রঞ্জিত, পুষ্পিত
• পাদপে লতায় ঢাকি
চারু ক্ষুদ্র অঙ্গ, বসন্তের গীত
গায় বসন্তের পাখী ।
সিমুলে পলাশে প্রকৃতি শ্রামাঙ্গে
আবির কুসুম মাখি,
গাইয়া কোকিলে, নাচিয়া অনিলে
মুদিছে মৃদল আঁখি ।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা স্নানীতল
ছাইয়া জাহ্নবী নীর,
শোভে নবদীপে, শান্তি স্বরূপিণী,
ছাইয়া জাহ্নবীতীর ।
তীরে মহামেলা ; সজ্জিত বিপনি
শোভিতেছে সারি সারি ।

কেহবা বেচিছে, কিনিছে কেহবা,
সংখ্যাভীত নরনারী ।

নাচিছে নর্তক, গাহিছে গায়ক
স্থানে স্থানে ভক্তি গীত ;
সাজি রাধাকৃষ্ণ হ'তেছে কোথায়
কৃষ্ণলীলা অভিনীত ।

ভারতীর লীলাভূমি নবদ্বীপ,
ভারতের জ্ঞানাকর ;
দেবী-পদাশ্রিত শ্বেতাজ্ঞ নদিয়া,
ছাত্রবৃন্দ মধুকর ।

শত অধ্যাপক, ছাত্র শত শত,
করিছে শাস্ত্র বিচার,
বসিয়া সৈকতে,—স্মৃতি দর্শনের
বেদ বেদাঙ্গের আর ।

বসি চক্রে চক্রে ভৃগু চক্রমত,
জ্ঞান মধু আহরণ
করিছে আনন্দে সহস্রে সহস্রে
ছাত্রবৃন্দ অগণন ।

ছুই অধ্যাপক বুঝিছে কোথায়
করি তর্ক বিস্তারিত,

বসি নশ্ব করে স্থলিত বসনে
বাহু জ্ঞান তিরোহিত ।
শাস্ত্র তর্ক ছাড়ি তীব্র গালাগালি
বর্ষে কোথা পরম্পরে ;
হাতাহাতি কোথা বাকি বড় নাই,—
ঘন ঘন টিকি নড়ে ।
বসি ঘাটে ঘাটে কহে শাস্ত্র-কথা
পণ্ডিত মহিলাগণ,—
নাকে নড়ে নথ, প্রকোষ্ঠে বলয়,
দোলে কর্ণ আভরণ ।
গল্পায় সঁতার কাটিতে কাটিতে
কহে ছাত্র শাস্ত্র-কথা,
কহে শাস্ত্র-কথা খেলিতে খেলিতে
তীরে শিশু যথা তথা ।
কহে শাস্ত্র-কথা মলয় অনিল
স্বনিয়া স্বনিয়া ধীরে,
কহে শাস্ত্র-কথা কুলু কুলু রবে
হিল্লোল জাহ্নবী নীরে ।
“হায় ! শাস্ত্র-কথা !”—আচার্য্য অদ্বৈত
কহিলা নয়নে জল,

শিবের কপোল বহি সুরধনী,
 ঝরিতেছে অবিরল ।
 মেলা প্রান্তে বসি সায়াহু গগন
 কহিলা কাতরে ধীরে—
 “হায় ! শাস্ত্র-কথা, শুষ্ক, মরুময় !
 বালি রাশি গঙ্গাতীরে !
 যায় ভক্তি গঙ্গা পতিতপাবনী
 বহিয়া শীতল ধারা,
 তুষিত মানব দেখে না তাহাকে
 শুষ্ক শাস্ত্রে দিশাহারা ।
 বেদ বেদান্তের ষড়্ দর্শনের,
 ঘূর্ণচক্রে পড়ি জীব,
 কিবা মরুদগ্ধ হইতেছে হায় !
 ভাবি আপনাকে শিব ।
 ক্ষুদ্র নর চাহে ক্ষুদ্র শাস্ত্রে তার,
 হস্ত আমলক মত,
 পাইতে তোমারে, বুঝিতে তোমারে
 হায় নাথ ! তর্ক-রত !
 ভূপতিত কণা চাহে বুঝিবারে
 হিমাদ্রির তুঙ্গ চূড় ;

না জানে ভক্তিতে পাইবে তোমায়,

তর্কে তুমি বহু দূর ।

গগন-পরশী আছে হিমাচল,

অণু-পরমাণু-ময় ।

কিন্তু পরমাণু নহে হিমগিরি,

জীব কভু শিব নয় ।

শাস্ত্র ব্যবহার, শাস্ত্র ব্যবসায়,

শাস্ত্র অন্ন, শাস্ত্র জল,

কিন্তু শাস্ত্রী-দোষে শাস্ত্র ভক্তিহীন,

ভক্তিহীন শাস্ত্রী দল ।

শাস্ত্রের সরল অন্তরের সুধা

হায় ! নাহি পায় নর ;

হায় ! খোসামাত্র করিয়া চর্কণ

হইয়াছে কি কাতর !

‘দর্শনে’ তোমায় পাইতে দর্শন

পড়িয়াছে তর্ক-জালে ;

নাহি দেখে নাথ ! তব বিশ্বরূপ

নয়নের অন্তরালে ।

হইয়াছে ধর্ম—অন্তঃসারহীন,

কেবল আচারগত ।



হইয়াছে ধর্ম বিগ্রহ বিহীন
সুন্দর মন্দির মত ।
আপনারা পাপী, ঘোর অবিশ্বাসী,
ধর্ম ব্যবসায়ীগণ ;
করাইছে হায় ! পরে প্রায়শ্চিত্ত
কঠোর কঠোরতম ।
একদিকে মায়াবাদের ভীষণ—
কি ভীষণ !—পরিণতি,
অন্যদিকে হায় ! সুরায় শোণিতে
তত্ত্বের কি অধোগতি ।
এইরূপে নাথ ! হ'য়েছে জগতে
অধর্মের অভ্যুত্থান ।
এস নাথ ! এস ! পরিপূর্ণ কাল,
কর জীব পরিত্রাণ ।”
ফাল্গুনী পূর্ণিমা ধীরে পূর্ণচন্দ্র
আকাশে উঠিলা ভাসি,
সুরধনী নীরে, সুরধনী তীরে,
বরষিয়া পূণ্যরাশি ।
ধীরে ধীরে ধীরে গ্রহণের ছায়া
হ'ল চন্দ্রে সঞ্চারিত ;

পুণ্যের আলোকে কৰ্মফল ছায়া
হইল যেন পতিত ।
“হরিবোল হরি !”—কণ্ঠে সংখ্যাতীত
উঠিল জাহ্নবী তীরে ।
“হরিবোল হরি !”—দেহ সংখ্যাতীত
পড়িল জাহ্নবী নীরে ।
“হরিবোল হরি !”—বাজিল মৃদঙ্গ
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ তীরে ;
বাজিল আরতি দোল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
দেবালয়ে, সৌধ শিরে ।
“হরি বোল হরি !”—নরনারী শিশু,
আনন্দে অধীর গায়,
“হরিবোল হরি !”—প্লাবিতা ধরণী
গগনে বহিয়া যায় ।
“হরিবোল হরি !”—রাহগ্রস্ত চন্দ্র
গাইছে বিপন্ন স্বরে,
“হরিবোল হরি !”—অসংখ্য নক্ষত্র
গাইছে ভকতি ভরে ।
“হরিবোল হরি !”—আচার্য্য অদ্বৈত,
গায় প্রেমে মাতোয়ারা—

“এস এস নাথ ! জুড়াও জগত

ঢালিয়া প্রেমের ধারা ।”

“হরিবোল হরি !”—মিশ্র জগন্নাথ

গাইলা ভকতি বুকে,

“হরিবোল হরি !”—আসন্ন প্রসূতি

শচীমা পবিত্র মুখে ।

“হরিবোল হরি !”—ভূমিষ্ঠ হইয়া—

গাইল কি শিশু হাসি ?

হরিনামামৃতে ভরিল জগৎ,

গগনে উঠিল ভাসি ।

“হরিবোল হরি !”—সেই শুভ দিনে

গাইছে নবীন কবি ।

প্রেম অশ্রুধারা বহিছে নয়নে,

নিরখি সে শিশু ছবি ।

সেই শিশু রূপে আমার শিশুরে

দেও নাথ ! পদ ছায়া,

এই শুভ দিনে দূর নির্বাসনে,—

মায়াময় তব মায়্যা !





দ্বিতীয় সর্গ।

শৈশব লীলা।

গ্রহণাস্তে ধীরে পূর্ণ-চন্দ্র ভাসে
বসন্তের নীল নির্মল আকাশে।
প্রসবাস্তে নর-অদৃষ্ট আকাশে
কি অমিয় হাসি শিশু-চন্দ্র হাসে !
কি সুন্দর শিশু ! অমিয় মিশ্রিত
ভরল কাঞ্চণে নির্মিত পুতুল।
কি সুন্দর মুখ, ভুরু সুবক্সিম,
আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন অতুল !
করুণ অরুণ কি নয়ন আভা,
করুণ অরুণ কোনায় হাসে !

ঢল ঢল ছল ছল ছু নয়নে
শীতল তরল করুণা ভাসে ।
কি রাতুল ক্ষুদ্র অধর যুগল,
ক্ষুদ্র কোকনদ কর কি রাতুল !
পতিত পাবন ক্ষুদ্র পদতল
কি রাতুল শোভা তরল হিঙ্গুল !
কিবা দীর্ঘ গ্রীবা, প্রশস্ত উরস,
উন্নত লম্বাট প্রতিভা নিলয় !
কিবা ক্ষীণ কটি নয়ন রঞ্জন,
অঙ্গের ভঙ্গিমা মহিমাময় !

* * * * *

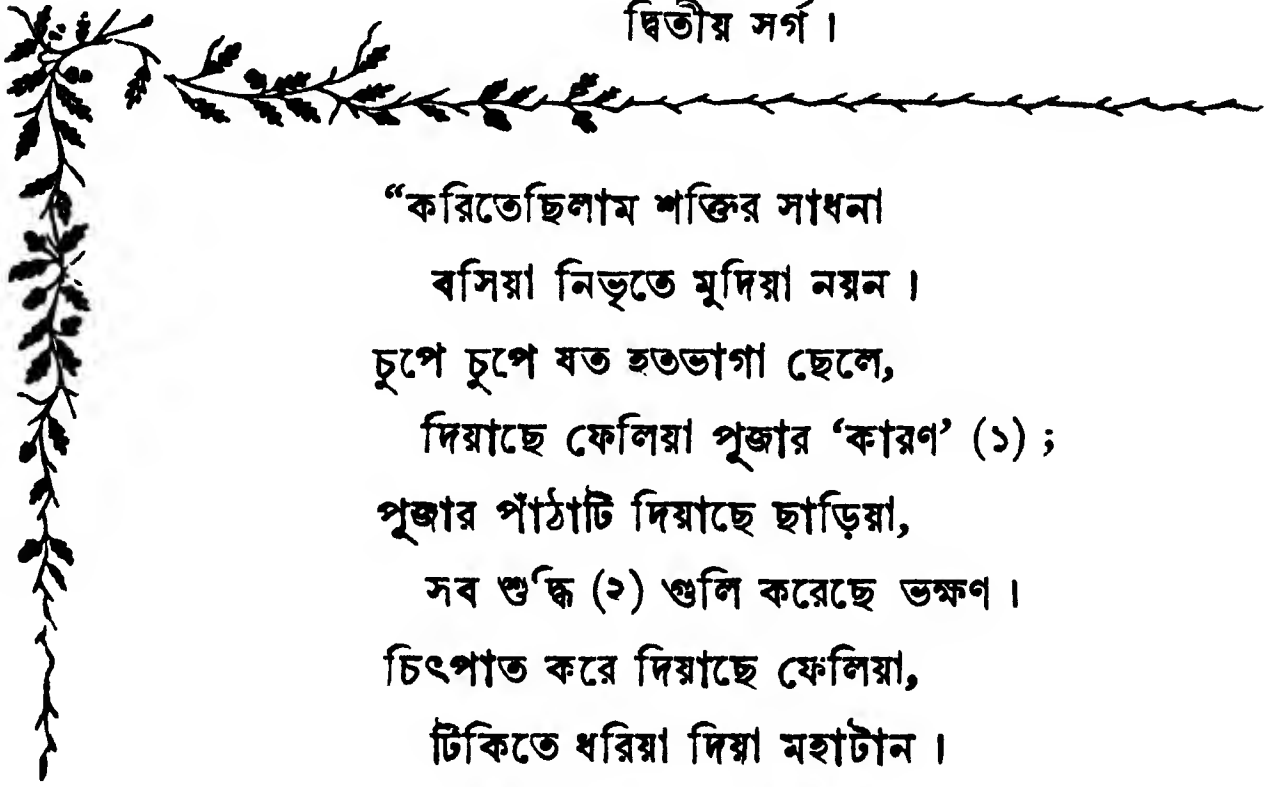
নিম্ববৃক্ষ তলে, স্মৃতিকার ঘরে,
জনমিল শিশু,—শচীমাতা তাই,
বহু শিশুহারা কাতরা জননী,
রাখিলেন নাম আদরে “নিমাই” ।
জ্যেষ্ঠ কুমারের নাম “বিশ্বরূপ,”
জনকের এই পুত্র অন্ততর,
পিতা জগন্নাথ ভক্তিতে অধীর
রাখিলা শিশুর নাম “বিশ্বমুর ।”

হেন গৌরবর্ণ দেখে নাই কেহ,
অঙ্গে কাঁচা সোনা গলিয়া বয়,
বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণ চম্পকের,
হলো “গৌর” নাম নবদ্বীপ ময় ।
কাঁদিতোছে শিশু, কহ হরিনাম,
কি বিষয় ! শিশু হইয়া নীরব,
চাহি শূন্য পানে রহে আত্মহারা,
যেন মৃগ শিশু ! শূন্য বংশীরব ।
সোনার পুতুলি লয়ে, কোলে তুলি,
কত নরনারী বলে ‘হরিবোল’ ।
কি যেন পুলকে ঈষদ্ ঈষদ্
হাসে দেব শিশু আলো করি কোল ।
বিনা হরিনাম না ঘুমায় শিশু,
নাহি করে শিশু মাতৃস্তন পান ।
দেয় হামাগুড়ি আনন্দে অধীর,
যদি কেহ গায় সুমধুর নাম ।
গাও হরিনাম, সোনার পুতুলি
আসিবে ছুটিয়া কোলেতে তোমার ।
শচীমার গৃহ হইল গোলক,
হরি নাম গান গৃহে অনিবার ।

* * * * *

বড়ই অধীর চঞ্চল নিমাই,
খেলে সারা দিন তীরে জাহবীর ।
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাহি রোদ্র বৃষ্টি,
থাকে সারাদিন খেলায় অধীর ।
কত সাধে মাতা দেন সাজাইয়া,
কতই বসনে ভূষণে ভূষিত,
কোথায় বসন ? ভূষণ কোথায় ?
আসে শিশু গৃহে ধূলা ধূসরিত ।
ছুটেছে পশ্চাতে ক্রোধে নারী কেহ,
হইয়াছে ভয় কলসী তাহার,
কারো শান্তিপূরী মনোহর সাড়ী,
চিত্রিত ধূলায় কদমে আর ।
কারো চক্ষে বালি,—ঘষিতেছে চোক,
কারো চন্দ্রমুখ কদমে চর্চিত,
কারো দীর্ঘকেশ পদে সুবাসিত,
কাহারো বা শিশু সদ্যঃ প্রহারিত ।
কোনও ব্রাহ্মণের শূত্র পুষ্পপাত্র,
ফেলিয়া নিমাই দিয়াছে ফুল,

কাহারো নৈবেদ্য করেছে ভক্ষণ,
 “লক্ষীছাড়া ছেলে যমের ভুল !”—
 গালি দিতে দিতে ক্রুদ্ধা নর নারী
 ছুটেছে পশ্চাতে বিচিত্র দল,
 ছুটেছে নিমাই নক্ষত্রের মত,
 শচীর অঙ্গনে উঠে কোলাহল ।
 কহে তারা—“শচি ! কেমনে ধরিলি
 এই কুলাঙ্গার উদরে ছার ?
 কোন্ রাজার বেটি তুই, যে সহিব
 নিত্য নিত্য ঘাটে এই অত্যাচার ?
 যত দুষ্ট ছেলে নিয়ে তোর ছেলে
 করিয়াছে এক “হরিনামী” দল,
 যারে পায় কহে—‘কহ হরিনাম !’
 না কহিলে গায়ে দেয় কাদা জল ।
 কেন, আমাদের ইষ্টদেব ওকি ;
 ওর কথা মতে কব হরিনাম ?
 তুই যদি নাহি করিস্ শাসন—
 নিশ্চয় তাহারে দিব বলিদান !”—
 আগম বাগীশ কহে গরজিয়া,
 কাঁধে ভীম খড়্গা, প্রবেশি প্রাঙ্গন,—



“করিতেছিলাম শক্তির সাধনা
বসিয়া নিভূতে মুদিয়া নয়ন ।
চূপে চূপে যত হতভাগা ছেলে,
দিয়াছে ফেলিয়া পূজার ‘কারণ’ (১) ;
পূজার পাঁঠাটি দিয়াছে ছাড়িয়া,
সব শুদ্ধি (২) গুলি করেছে ভক্ষণ ।
চিৎপাত করে দিয়াছে ফেলিয়া,
টিকিতে ধরিয়া দিয়া মহাটান ।
কহে ছোঁড়াগুলা হাসি খল খল,—
‘নিমাইর আজ্ঞা, কহ হরিনাম !’
রাজপুত্র উনি !! আজ্ঞা মতে ওঁর,
আমি মহাশাক্ত নিব হরিনাম !
বলি দিয়া ওকে, ফেলিব গজায়
কাটিয়া মিশ্রের কুঁড়িয়াখান ।”
প্রকাণ্ড উদর রক্ত বস্ত্রাবৃত,
মদিরায় ছুই আরক্ত নয়ন,
দোলায়ে উদর আশ্ফালিছে অসি,
মস্তকে টিকির অপূর্ব নর্তন !

(১) কারণ—মদ । (২) শুদ্ধি—মদের চাট ।

Jhikira Kodarnath Sadharan Pathagar.

Jhikira. Howrah

Accession No. Call No.

কহে শচী মাতা কাতরে সকলে—

“ক্ষেপা ছেলে, বাছা ! নাহি কিছু জ্ঞান ।

অবোধ শিশুরে ক্ষমা কর সবে !

হইয়াছে অপদেব অধিষ্ঠান ।

হাঁরে ক্ষেপা ছেলে ! না যাইতে কোথা

কত করি মানা, শুন না কিছু ।

আজি তোরে শিক্ষা দিব আমি দেখ !”—

ছুটিলা জননী নিমাইর পিছু ।

যেখানে উচ্ছিষ্ট হাঁড়িগুলা আছে,

তথা সিংহাসন পাতিয়া নিমাই,

কহে—“কেন ওরা নাহি লয় নাম

জিজ্ঞাস ! আমার কোনও দোষ নাই ।”

হাহাকার করি কহেন জননী—

“নিমাই ! নিমাই ! কি করিলি বল্ ?

ব্রাহ্মণের ছেলে হইলি অশুচি,

মারিব না, চল্ গঙ্গায় চল্ !”

হাসি কহে শিশু—“তুই বলেছিস্

অশুচিও শুচি হরি নামে হয় ।

আমি হেথা বসি গাব হরি নাম,

হাঁড়িগুলা শুচি হইবে নিশ্চয় ।

আর যে ইহারা নাহি লয় নাম,
ইহারা কি তবে অশুচি নয় ?”
শিশুর বদন গন্তীর এমন
নর নারী সবে মানিল বিশ্বয় !

* * * * *

চলেছে মুরারি যুবক, স্রবৈদ্য,
‘যোগবাশিষ্ঠে’তে পরম পণ্ডিত,
নাড়ি মাথা হাত বুঝার সঙ্গীরে
জীব শিব ভিন্ন নহে কদাচিত ।
পশ্চাৎ হইতে কহে শিশুগণ—
“ওহে কবিরাজ ! বল হরি হরি !”
না শুনিল কথা, জ্ঞানের চর্চায়,
চলেছে মুরারি আপনা পাসরি ।
হঠাৎ শিশুর হাসি করতালি .
শুনিয়া মুরারি ফিরিয়া চান,
মাথা হাত নাড়ি, নকল তাহার
করি পিছে পিছে নিমাই যায় ।
কটাক্ষে চাহিয়া, কিছু না কহিয়া
পুনঃ ব্যাখ্যা করি চলিল মুরারি ।

পুনঃ হাসি রোল ; আবার নিমাই

চলেছে পশ্চাতে মাথা হাত নাড়ি ।

গেল ভাসি ‘যোগবাশিষ্ঠ’ এবার,

কহিল মুরারি ক্রোধে গর গর—

“জন্মেছে অকাল কুখ্যাণ্ড মিশ্রের !”

শিশু কহে—“শিক্ষা পাইবে সত্ত্বর ।”

গৃহে ফিরি গিয়া, করিছে ভোজন,

চুপে চুপে চুপে নিমাই গিয়া,

মুরারীর পাতে করে মূত্রত্যাগ,

রহিল মুরারি অবাক হইয়া ।

“কি করিলি ওরে মিশ্র কুলাঙ্গার”—

জিজ্ঞাসে মুরারি আপনা সত্ত্বর ।

শিশু কহে—“হরি না বলে যে জন,

সেই পাষাণের এ দশা করি ।”

পালাইল শিশু ; ওকি আবরণ

নয়ন হইতে পড়িল ধসি !

“এ শিশুটি কে ?”—ভাবিল মুরারি

বিস্মিত, স্তম্ভিত, আত্মহারা বসি ।

স্তম্ভিত মুরারি মিশ্রের কুটীরে

আসিল, কি ভাবে যেন আত্মহারা ।

প্রণমি শিশুরে রহিল চাহিয়া,
বহে ছু নয়নে ভকতির ধারা ।
লুকাইল শিশু মায়ের অঞ্চলে
উজ্জল নক্ষত্র অঞ্চলে উষার,
কহে শচীমাতা, কহে জগন্নাথ,—
“কি করিলে বৈদ্য ?” করি হাহাকার ।
“পরম পণ্ডিত তুমি প্রণমিলে,
হইবে শিশুর ঘোর অকল্যাণ !
ক্ষেপা শিশু, যদি ক’রে থাকে দোষ,
ক্ষম দয়া করি, তুমি জ্ঞানবান !”
মুরারির ‘যোগবাশিষ্ঠ’ ভাসিয়া,
গিয়াছে ভাসিয়া সোহহংজ্ঞান ।
কহিল মুরারি ভাবেতে বিভোর—
“জান নাহি মিশ্র কে তব সন্তান ।
আজি হ’তে আমি গাব হরিনাম,
করিব শিশুর লীলা অধ্যয়ন ;
আজি শিশু নেত্র খুলিয়াছে মম,
খুলিয়াছে মম নেত্র আবরণ ।” *

* প্রজ্ঞানন্দ শিশির বাবু বলেন, এই মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদ্য লীলা বর্ণনা
করিয়াছেন । গ্রন্থের নাম—“মুরারি গুপ্তের কড়চা” ।

ভাবেতে বিভোর চলিল মুরারি,
হুই বাহু তুলি গাই হরিনাম,
সেই হরিনাম শুনিতোছে শিশু,
কুরঙ্গ শাবক যেন বংশীগান ।

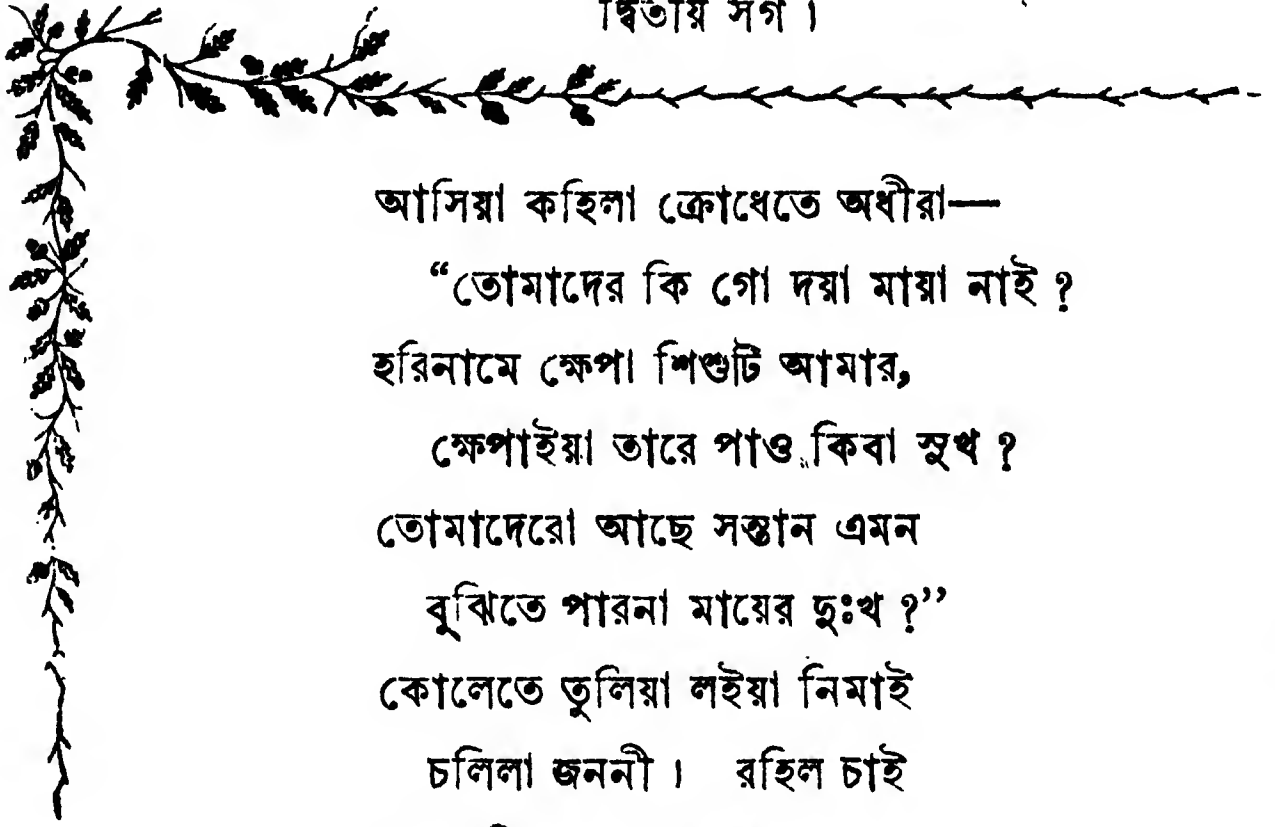
* * * * *

ওকি দৃশ্য মরি ! আর এক দিন
ওকি দৃশ্য, ওই জাহ্নবী পুলিনে !
নাচিছে নিমাই সঙ্গীগণ সঙ্গে,
শোভিছে সৈকত কোরক নলিনে ।
নাচে শিশুগণ দিয়া করতালি,
বর্ষে শিশু কণ্ঠে হরিনাম সুধা ।
ফেন নাচে, গায়, কি গায় না জানে,
নাহি কিছু জ্ঞান, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা ।
শিশুদের মাঝে নাচিছে নিমাই,
সোনার পুতুলি চাহি উদ্ধ পানে,
হুই বাহু তুলি, কি ভাবে বিভোর !
কি যেন উচ্ছ্বাস শিশুর প্রাণে !
সঙ্গীগণ মিলি দিয়াছে বাঁধিয়া
টাঁচর চিকুরে কি চূড়া সুন্দর !

দ্বিতীয় সর্গ ।

দিয়াছে পরায়ে অঙ্গে চারু ধড়া,
দিয়াছে করেতে বাঁশী মনোহর ।
দিয়াছে গলায় বনফুল হার ;
চর্চিত চন্দনে ললাট, উরস ;
উক্ক দুই কর শোভিছে চঞ্চল,
গঙ্গার তরঙ্গে যেন তামরস ।
ক্ষীণ কটিতট আঁটা কটি বাসে ;
কি ত্রিভঙ্গ লীলা অঙ্গে মনোহর !
কিবা তালে তালে রক্ত কোকনদ
খেলিতেছে ক্ষুদ্র চরণ সুন্দর ।
আরক্ত আয়ত যুগল নয়নে,
ভাসিতেছে কিবা করুণা তরল !
নয়ন কোণায় দুই ফোঁটা ঝল,
শোভিতেছে দুই মুকুতা উজ্জল !
মুখে হরিনাম, অঙ্গে হরিনাম,
অঙ্কিত চন্দনে শ্বেত সুবাসিত,
শিশুর অন্তরে জাগে হরিনাম,
হরি যেন শিশু দেহে অধিষ্ঠিত ।
নর নারীগণ বেষ্টি শিশুদল,
দেখিছে এ নৃত্য নাহি বাহু জ্ঞান ।

ভুলিয়াছে নারী কক্ষের কলসি,
ভুলিয়াছে মাতা বক্ষের সন্তান ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুষ্পপাত্র করে,
আছে দাঁড়াইয়া চিত্রিত মত ।
উড়িয়া পাত্রে ফুলদল যেন,
হয়েছে সৈকতে নৃত্য ক্রীড়ারত ।
ভাবিতেছে মনে—একে শিশু ? একি
ব্রজের গোপাল এল নদীয়ায় ?
একি শিশু খেলা ? গলে কি এমন
মানবের মন শিশুর খেলায় ?
দিয়া করতালি নাচি শিশুগণ,
চাহি উৰ্দ্ধ পানে গায় হরিনাম ।
বাজে করতালি নর নারী প্রাণে
গায় হরিনাম নর নারী প্রাণ ।
রাখি পুষ্পপাত্র ভূতলে অবশ,
রাখিয়া অবশা কক্ষের কলস,
নাচে নর নারী শিশু সহ মিলি,
গায় হরিনাম ভক্তিতে অবশ ।
শুনিলে শচীমা হরিনাম রোল,
বুঝিলে এ খেলা খেলিছে নিমাই ।



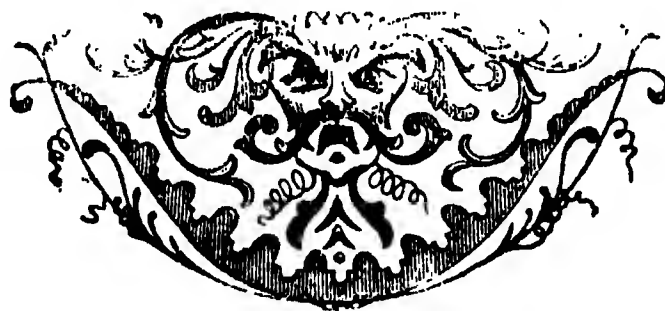
আসিয়া কহিলা ক্রোধেতে অধীরা—

“তোমাদের কি গো দয়া মায়া নাই ?
হরিনামে ক্ষেপা শিশুটি আমার,
ক্ষেপাইয়া তারে পাও কিবা সুখ ?
তোমাদেরো আছে সন্তান এমন
বুঝিতে পারনা মায়ের দুঃখ ?”
কোলেতে তুলিয়া লইয়া নিমাই
চলিলা জননী । রহিল চাই
নর নারীগণ, স্বপ্ন ভঙ্গ যেন
মুখেতে কাহারো কথাটি নাই ।

কবি কহে—মাগো ! আকুল পরাণ
তোর ক্ষেপা ছেলে লইতে কোলে !
আসিছে আগার শিশুটি এমন,
তরী তার সিন্ধু তরঙ্গে দোলে ।
এমনি সে নাচে, এমনি সে গায়,
মা ! তোর ছেলের এ লীলা গীত,
দিয়া করতালি ভাবেতে বিভোর,
হৃদয় করুণা সলিলে পূরিত ।

অমৃতাত ।

আকুল এমন আমাদের প্রাণ
লইতে তাহারে কোলেতে তুলি ;
দিও তোর ক্ষেপা শিশুর চরণ
মস্তকে, দিও মা ! চরণ ধূলি ।



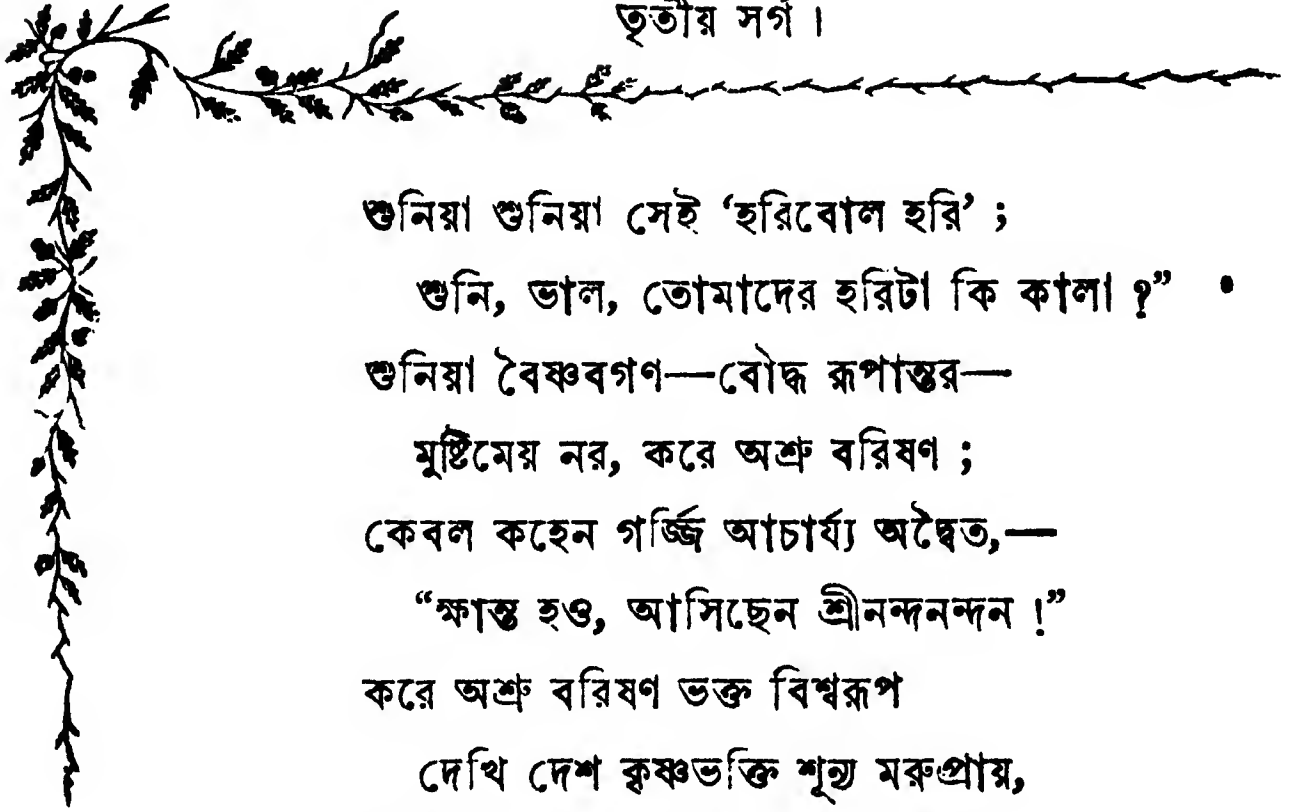


তৃতীয় সর্গ ।

বিশ্বরূপ ।

গীতা শ্রীকৃষ্ণের, গাথা শ্রীবুদ্ধদেবের,
সেই মহা বাক্য—“ধর্ম অহিংসা পরম,”
তিরোহিত ভারতের হৃদয় হইতে,
অস্তমিত দিনকর কিরণ যেমন ।
কেবল সে ধর্মগাথা, গীত অতীতের,
গিরিবক্ষে, শৈলস্তম্ভে রয়েছে অঙ্কিত ।
হিংসা-ধর্ম তান্ত্রিকের হায় ! বঙ্গদেশ
করিতেছে নররক্তে রঞ্জিত, প্লাবিত ।
করে শক্তি পূজা, দেয় শক্তি পরিচয়
দিয়া ছাগ মহিষের শিশু বলিদান—

নিরমম নিষ্ঠুরতা ! পিশাচের মত
নাচে ছিন্নমুণ্ড শিরে, করে রক্তপান !
ঘোর অন্ধ নর ! হিংস্র পশুগণও হায় !
আপন সন্তান কভু করে না ভক্ষণ,
পরম করুণাময়ী জগত জননী
তিনি কি নিশ্চম হিংস্র পশুর অধম ?
করে পূজা, ধন পুত্র বিদ্যা কামনায়,
নিষ্কাম বৈষ্ণব দেখি করে উপহাস ।
কহে—“মহা তপস্বীও দেখিয়াছি মরে,
মদ্য মাংস মৎস্ত ছাড়ি কেন খাও ঘাস ?
স্মৃতি তাহার,—চড়ি দোলায়, ঘোড়ায়,
ঐরাবতে ইন্দ্রমত বেড়ায় যে জন,
কামিনী কাঞ্চনে পূর্ণ হস্তে যেই জন
নিজা যায় করি পঞ্চ মকার সেবন ।
এত গৌসাইর ভাবে মর যে কাঁদিয়া,
দরিদ্রতা গৌসাই কি করেন মোচন ?
ঘন ঘন হরি বলি কর যে চীৎকার,
ক্রুদ্ধ হন হরি শুনি ঘাঁড়ের গর্জন ।
তাই দেশে অন্ন কষ্ট, না ভরে উদর
যত খাই ; ভাঙ্গে ঘুম, কান ঝালাপালা,

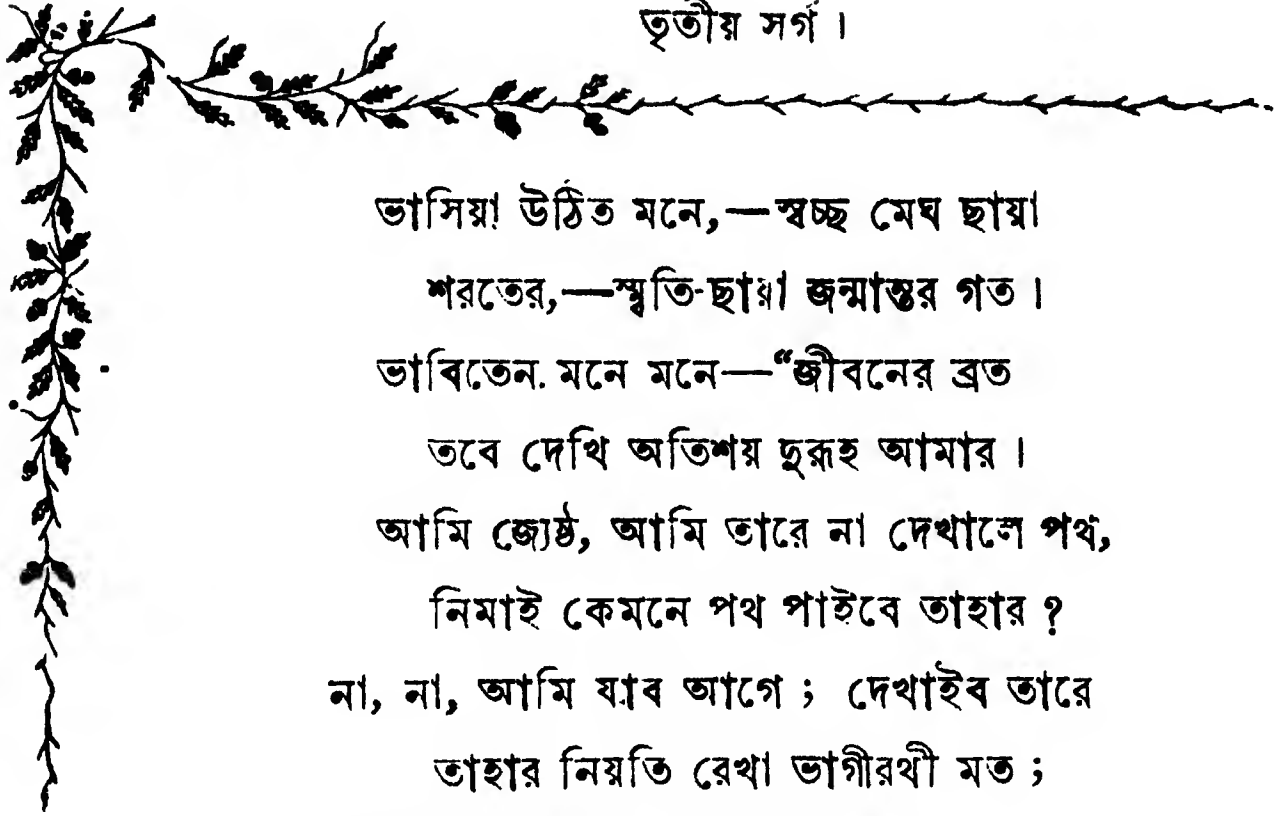


শুনিয়া শুনিয়া সেই 'হরিবোল হরি' ;
 শুনি, ভাল, তোমাদের হরিটা কি কালা ?” •
 শুনিয়া বৈষ্ণবগণ—বুদ্ধ রূপান্তর—
 মুষ্টিমেয় নর, করে অশ্রু বরিষণ ;
 কেবল কহেন গর্জি আচার্য্য অদ্বৈত,—
 “ক্ষান্ত হও, আসিছেন শ্রীনন্দনন্দন !”
 করে অশ্রু বরিষণ ভক্ত বিশ্বরূপ
 দেখি দেশ কৃষ্ণভক্তি শূন্য মরুপ্রায়,
 গীতা, ভাগবত, কেহ পড়ে না কখন ;
 পড়ে যদি, 'ভক্তি ব্যাখ্যা' আসে না জিহ্বায় ।
 উন্মত্ত কুতর্কে, কুটতর্কে নবদ্বীপ,
 দেখি প্রাণে বিশ্বরূপ বড় ব্যাথা পায় ;
 এক ক্ষীণা ভক্তি ধারা,—পতিত পাবনী
 হিমাদ্রি কন্দরে—বহে অদ্বৈত সভায় ।
 একদিন উষাকালে করি গঙ্গা স্নান
 বিশ্বরূপ সে সভায় গেল ধীরে ধীরে ;
 নবীন যৌবন, বর্ণ সুবর্ণ তরল,
 কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ শোভিতেছে শিরে ।
 রূপের লাবণ্যে মিশি মাধুর্য্য ভক্তির,
 ললাটে নয়নে ভাসে কি শাস্তি উদাস !

সুকোমল পাদক্ষেপ, আনত বদন,
কি নম্রতা হৃদয়ের করিছে প্রকাশ !
ষোড়শ বৎসরে যুবা পরম পণ্ডিত,
কহে কৃষ্ণভক্তি কথা, বহে অশ্রুধারা ;
শুনিয়া বিস্মিত সবে ; করেন হৃষ্কার
আনন্দে অদ্বৈত প্রভু প্রেমে আত্মহার।
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে করি আলিঙ্গন
লইলেন কোলে করি বহু আশীর্বাদ ।
শঙ্কর অঙ্কেতে যেন শোভিল কুমার,
প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ ছাড়ে সিংহনাদ ।
কচি মুখে কৃষ্ণকথা কতই মধুর,
মোহিত করিছে সবে সেই সুধা পান,
অতীত মধ্যাহ্ন বেলা ; আসিল নিমাই
অশ্বেষিয়া বিশ্বরূপে খুঁজি নানা স্থান ।
ওকি শিশু ! সমুজ্জল সোণার বরণ ;
প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলা সুন্দর !
আয়ত লোচন, আলুলায়িত সুন্দর
কুন্তল কুঞ্চিত শোভে ললাট উপর ।
ঈষৎ হাসিয়া—হাসি কৌমুদী আভাস,—
কহে—“চল খেতে দাদা ! ডাকিছেন মায় ।”

কি মধুর শিশু কণ্ঠ ! জুড়াইল প্রাণ
 ভক্তদের সেই কণ্ঠে—অমিয় ধারায় ।
 চলিলেন বিশ্বরূপ, চলিল নিমাই,
 ধরি অগ্রজের কর নাচিয়া নাচিয়া
 সোণার পুতুলি মত ; প্রতি পদক্ষেপে
 ভক্তদের হৃদয়েতে পুষ্প বরষিয়া ।
 এ শিশুটি কে ? এই রূপ নিরূপম ?
 মানব শিশুর রূপ হয় কি এমন ?—
 ভাবিতেছে ভক্তগণ, রয়েছে চাহিয়া
 সমাধিস্থ যেন, মুখে না সরে বচন ।
 ভাবেন অদ্বৈত—কেন শিশুটি আমার
 যখনই দেখি করে চিত্ত আকর্ষণ ?
 কিবা জন্মান্তর স্মৃতি ভাসে যেন মনে ;
 কিবা ভবিষ্যৎ আশা জুড়ায় জীবন ।
 আহারান্তে বিশ্বরূপ আসিলা আবার,
 মত্ত ভূঙ্গ যথা পুষ্পে পরিমলময় ;
 কাটালেন অপরাহ্ন, অর্দ্ধ নিশীথিনী,—
 কৃষ্ণ সংকীর্ণনে মুগ্ধ কিশোর হৃদয় ।
 সংসারের সূখে চিত্তে সূখ নাহি পায়,
 নিরবধি থাকে তথা কৃষ্ণ সংকীর্ণনে ;

সংসারে বিরাগ, গৃহে থাকে যতক্ষণ,
বিষ্ণুগৃহে নিরঞ্জে থাকে অধ্যয়নে ।
দরিদ্র সরল বৃদ্ধ পিতা জগন্নাথ,
পুত্রের এ ভাব দেখি হইলা কাতর ;
করিল সংকল্প পুত্রে করি পরিণীত,
করিবেন বৈরাগ্যের এ ছায়া অন্তর ।
শুনি বিশ্বরূপ মনে হইলা ব্যথিত,
ছাড়িবেন এ সংসার করিলেন স্থির,
তাহার একই সুখ, একই বন্ধন,
নিমাই প্রাণের ভাই চঞ্চল অধীর ।
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মাতা, কে রাখিবে তারে ?
কে করিবে শিক্ষা দান করিয়া যতন ?
শিশুর চাঞ্চল্য লীলা ভাবি কিস্তি মনে,
দেখিতেন বিশ্বরূপ কি যেন স্বপন !
ভাবিতেন,—“আসিছেন নন্দের নন্দন—
কহেন অদ্বৈত সদা ~~ধর্ম~~ মূর্তিমান্ ।
নিমাই কি তবে সেই নন্দের নন্দন ?
আমি কি তাহার সেই জ্যেষ্ঠ বলরাম ?”
তখন সে বৃন্দাবন স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রায়,
তখন সে ব্রজলীলা স্বপ্ন-স্মৃতি মত,



ভাসিয়া উঠিত মনে,—স্বচ্ছ মেঘ ছায়া
 শরতের,—স্মৃতি-ছায়া জন্মান্তর গত ।
 ভাবিতেন মনে মনে—“জীবনের ব্রত
 তবে দেখি অতিশয় দুঃস্থ আমার ।
 আমি জ্যেষ্ঠ, আমি তারে না দেখালে পথ,
 নিমাই কেমনে পথ পাইবে তাহার ?
 না, না, আমি যাব আগে ; দেখাইব তারে
 তাহার নিয়তি রেখা ভাগীরথী মত ;
 নিমাই এ মরুভূমি করিবে উদ্ধার,
 পতিতপাবনী সুধা ঢালি অবিরত ।”
 “মা । মা”—কহে বিশ্বরূপ শচীকে ডাকিয়া,
 “বল মা ! একটা কথা রাখিবে আমার ।
 যখন হইবে বড় প্রাণের নিমাই,
 এই পুঁথি খানি তারে দিও উপহার ।”
 “সেকি কথা ! !”—কহে শচী হইয়া বিস্মিতা
 “তুমিহঁত দিতে ইহা পারিবে তাহার ।”
 “দিব আমি, কিন্তু গাতঃ ! জীবন মরণ
 নাহি আসে জান তুমি নর গণনায় ।”
 “বালাই ! বালাই !”—কহে মাতা স্নেহময়ী—
 “মায়েরে এমন কথা বলিতে কি আছে ?

সহস্র বৎসর আয়ুঃ হউক তোমার !”
পু থিথানি পূণ্যবতী রাখিলেন কাছে ।

হেমন্ত মধ্যম, নিশি তৃতীয় প্রহর,
উঠিলেন বিশ্বরূপ ; মাতুল তনয়
উঠিলেন লোকনাথ । ষোড়শ বৎসর
উত্তীর্ণ ; এখনো হায় ! বালক উভয় ।
নিদ্রা অভিভূত গৃহ, নদীয়া নগরী ;
কেবল অনিদ্র এই বালক যুগল
কাটায়েছে সারা নিশি ; অজ্ঞাত উচ্ছাসে
গুনিয়েছে হৃদয়ের কম্পন কেবল ।
আসি গৃহ আজিনায় করিলা প্রণাম
জনক জননী পদে পড়িয়া ভূতলে,
চলিলেন বিশ্বরূপ ; ভ্রাতা সহচর
চলিলেন লোকনাথ । ভাসি অশ্রুজলে
কহিলেন বিশ্বরূপ—“হরি দয়াময় !
নিমাইকে দিও স্থান চরণে তোমার !
দিও স্থান এ বালকে ! আত্ম বলিদান
লও বালকের ! কর পতিত উদ্ধার !”

তৃতীয় সর্গ ।

চলিল যুগল শিশু, উচ্ছ্বাসে আকুল,
একখানি পুঁথি মাত্র পথের সম্বল ।
তৃতীয় প্রহর নিশি ঘাটে নাই তরী,
তরী, মাঝি, ভাগীরথী নিদ্রিত সকল ।
বাম করে পুঁথিখানি করি উত্তোলিত,
হইলেন গঙ্গাপার সাঁতারি নীরবে ।
সুসুপ্তা প্রকৃতি, আছে ভক্তিতে নীরবে
চাহিয়া নক্ষত্রগণ ফুটি নৈশ নভে ।
হইলা 'শঙ্করারণ্যপুরী' বিশ্বরূপ
ষোড়শ বৎসরে করি সন্ন্যাস গ্রহণ ।
বজ্রাহত জগন্নাথ, শচী অভাগিনী,—
ব্যাপি সর্ব নবদ্বীপ উঠিল ক্রন্দন ।
ষোল বৎসরের শিশু হইল সন্ন্যাসী ;
ষোল বৎসরের শিশু দিল জলাঞ্জলি
সকল সংসার সুখে, বৃক্ষতলবাসী—
হ'ল ভিক্ষাব্যবসায়ী, দিল আশ্রয়বলি—
কে দিবে সাহসনা করে ? কে দিবে সাহসনা
বহুশিশু শোকাতুরা শচী জগন্নাথে ?
কি করুণ দৃশ্য হই তরুণ সন্ন্যাসী,—
কাঁধে ভিক্ষা ঝুলি, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে !

হইল পবিত্র কুল পুত্রের সন্ধ্যাসে—

একই সাস্তনা ; চিন্তা হইল তখন,
শোকের উপরে, শিশু ষোল বৎসরের
কেমনে সন্ধ্যাস ব্রত করিবে পালন ।

বজ্রের কঠিন ব্রত করিবে পালন

শিরিষ কুমুম ? পাবে দৃঢ়তা শিলার
নবনীত ? চক্রবাত্যা, হায় ! বিভীষণ

কেমনে সহিবে শিশু তরু সুকুমার ।
ধর্মপ্রাণা শচী, ধর্মপ্রাণ জগন্নাথ

কহে গলদশ্রু কণ্ঠে বিদীর্ণ হৃদয়ে,—
“নারায়ণ ! দেও ভিক্ষা, শিশু সুকুমার
ধর্ম নষ্ট করি যেন না ফিরে আলয়ে !

এইরূপ শোকানলে জ্বলিতে মরিতে—

দীনহীন এ ছুটির এ নিয়তি যদি,
জলিব, মরিব নাথ ! দিও বালকেরে

পালিতে নিয়তি তার শক্তি নিরবধি !”

দেবী মাতা, দেব পিতা, ভ্রাতা দেবোপম,
না হইলে এইরূপ ; আত্ম বলিদান

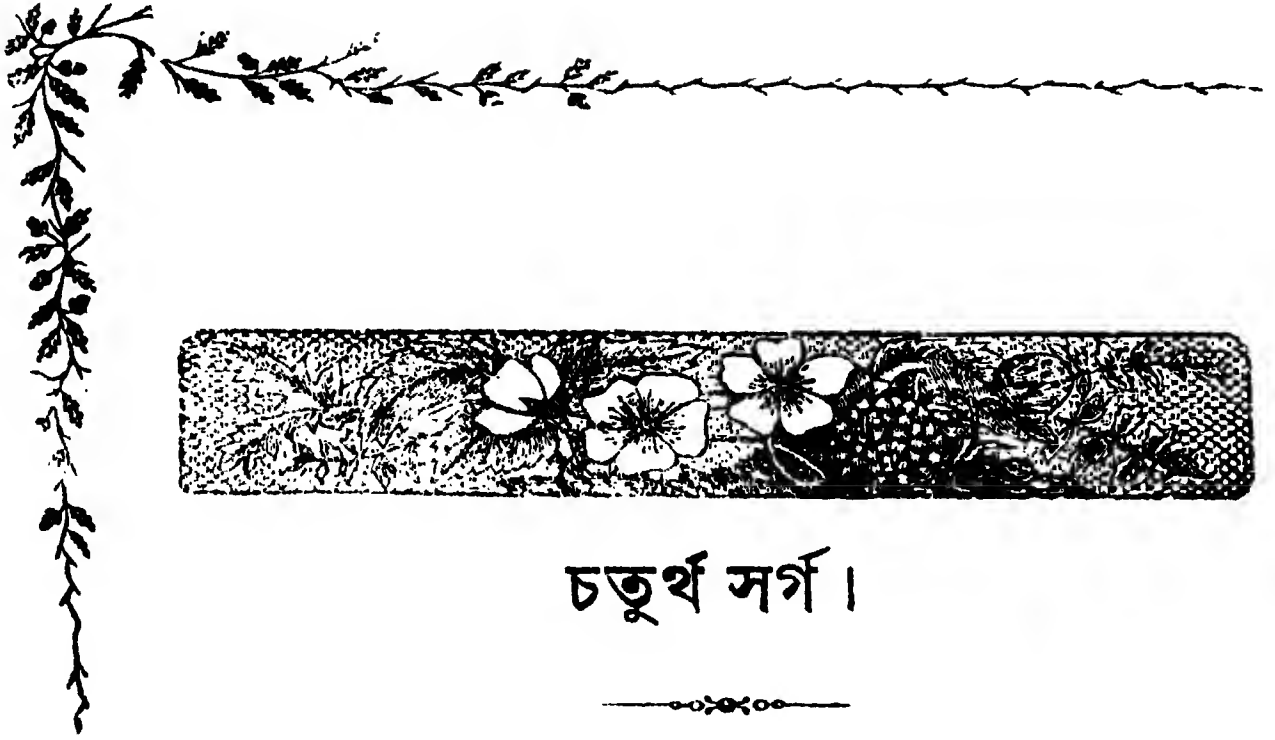
নাহি দিলে এইরূপে ধর্ম বেদীমূলে,

হইবেন কেন পুত্র, ভ্রাতা ভগবান ?

তৃতীয় সর্গ ।

ফলে মহারত্ন মহাগর্ভে পয়োধির,
ফলে গর্ভে পুণ্যবতী মাতা বসুধার ;
শশাঙ্কে অমৃত, জন্মে জ্যোতিঃ দিবাকরে ;
জন্মে বিশ্ব গর্ভে মহা বিশ্ব-নিয়ন্তার ।





চতুর্থ সর্গ ।

উপনয়ন ।

চঞ্চল অস্থির শিশু, কিন্তু বিশ্বরূপে
প্রাণের অধিক ভালবাসিত নিমাই,
নিমাই করিত ভয় পিতার অধিক ;
আজি শূণ্য গৃহ, সেই বিশ্বরূপ নাই ।
যে চাঞ্চল্য তরঙ্গেতে যাইত ভাসিয়া
পিতার শাসন, স্নেহ করুণা মাতার,
একটী স্নেহ বিশ্বরূপের কথায়,
হইত সে চাঞ্চল্যেতে শান্তির সঞ্চার ।
বড়ই কাঁদিল শিশু ; বড়ই কাতর
হইল কোমল প্রাণ বিরহে ভ্রাতার ।

“দাদা ! দাদা !”—বলি শিশু যাইছে ছুটিয়া,
রাখে ধরি পিতা মাতা প্রতিবেশী আর ।

কোমল করুণ প্রাণ সহিল না আর ;

—কোমল কুসুম দল নাহি সহে ঝড়—
মুচ্ছিত হইল শিশু । ভুলি নিজ শোক
শচীমাতা জগন্নাথ হইলা কাতর ।

মুচ্ছান্তে কহিল—“মা ! মা ! এসেছিল দাদা,
পরিয়াছে কি সুন্দর গেরুয়া বসন !

অঙ্গে শত সূর্য্য প্রভা, মুণ্ডিত মস্তক,

করে দণ্ড কমণ্ডলু প্রশান্ত বদন ।

কতই আদরে দাদা কহিল—“নিমাই !

তুইও সন্ন্যাস নে ভাই ! আমার মতন !

আয় সঙ্গে, এ সংসার ছাড়ি ভক্তিহীন

ছুই ভাই হরিনাম করি বিতরণ ।”

আমি কহিলাম—“আমি বালক এখন ।

কেমনে সন্ন্যাস দাদা ! করিব পালন ?

থাকি গৃহে আমি বৃদ্ধ বৃদ্ধা নিরাশ্রয়,

জনকের জননীর সেবিব চরণ ।

কহিলেন দাদা তবে—“থাক তবে ঘরে,

থাক জুড়াইয়া বুক পিতার মাতার ।



যাই আমি ডাকিছেন শ্রীকৃষ্ণ আমায় ।

যাই আমি, তব পথ করি পরিষ্কার ।’

ওনি জনকের মুখ হইল গম্ভীর ।

ভাবিলেন মনে মনে, কহিলেন আর
ভক্তিভরে—“নারায়ণ ! এ ভগ্ন কুটার !—

হরিওনা শেষ অবলম্বন তাহার !”

শচীদেবী শোকে স্নেহে আকুলা অধীরা.

চুস্থিলেন পুত্র মুখ আবার আবার ।

চুস্থে যথা উষাদেবী কণক কমল,

চুস্থে পবিত্রতা যথা প্রেম স্নকুমার ।

কহিলেন শোকাকুলা—“না, না, বাপধন !

সন্ন্যাসী হইতে তোরে দিব না কখন ।

ছুটিল যে ক’টি ফুল এ দীনা লতায়,

একে একে নারায়ণ করিলা গ্রহণ

পদতলে পুষ্পপাত্রে ! সেই পুষ্পপাত্রে

করিয়াছে বিশ্বরূপ আত্মসমর্পণ ।

সেই সব শূন্যরস্তু একই কুসুম

নিমাই আমার তুই, মায়ের জীবন ।

নিমাই রে ! অন্তগামী দুটি জীবনের

শেষ আলো, শেষ আশা বাছনি আমার !

তুই রে নিশ্বাস শেষ ! হইলে অস্তর
তুই, পিতা মাতা তোর বাঁচিবে না আর ।”

* * * *

নবম বৎসর ; উপনয়ন সময় ;
হইল শচীর গৃহ উৎসব পূরিত ।
সোনার পুতুল, অঙ্গে বালার্ক কিরণ,
করে দণ্ড, পৃষ্ঠে ঝুলি, মস্তক মুণ্ডিত ।
স্বর্ণ পুতুলের অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ,
আয়ত নয়নে কিবা দেবত্ব আবেশ !
কি করুণা মুখে ! কিবা করুণা অসীম
পড়িছে ঝরিয়া বাহি শ্রীঅঙ্গ নবীন !
সমবেত নিমজ্জিত পণ্ডিত মণ্ডলী,
আত্মীয় আত্মীয়া সমবেত নিমজ্জিত
হইল সজল নেত্র ; পিতা জগন্নাথ
করিলা সজল নেত্রে তনয়ে দীক্ষিত ।
কহিলা প্রণব কর্ণে—প্রণব ! প্রণব !
শক-ব্রহ্ম ভারতের ! মহাশক ওঁ !
বেদ উপনিষদের গীত অদ্বিতীয়
অমর, অক্ষয়, নিত্য । বিদ্যারিয়া ব্যোম

গাইতেছে মহাবিশ্ব গীত অদ্বিতীয়
বিঘূর্ণিত—বিঘূর্ণন মহাশব্দ ওঁ !
ভারতের ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব আর,
একশব্দে পরিণত—মহাশব্দ ওঁ ।
কহিলা গায়ত্রী—‘স্বর্গ—পৃথিবী—আকাশ
ব্যাপিয়া আছেন যিনি, আমাদের জ্ঞান
করেন প্রকাশ যিনি, সেই সবিতার
বরণীর আলোকের করি আমি ধ্যান ।’
কালজয়ী মহামন্ত্র—অমর, অক্ষয় !
ব্যাপি চারিযুগ, ব্যাপি অনন্ত অতীত
উঠেছে, উঠিবে ব্যাপি মহা ভবিষ্যত
কত উর্দ্ধে—মহা উর্দ্ধে—এই মহাগীত !
মহাধর্ম, মহাজ্ঞান, কবিত্ব মহান্
একাক্ষরে, এক মহামন্ত্রে সঙ্কলিত,
অতীতের ইতিহাস, অতীত আলোক,
অতীতের মহাশিক্ষা—এ গায়ত্রী গীত !
গায়ত্রী—নক্ষত্র ধ্রুব জ্ঞানের আকাশে !
গায়ত্রী—নক্ষত্র ধ্রুব সংসার-সাগরে !
গায়ত্রী—হিমাদ্রিসারু—মানব চিন্তার !
গায়ত্রী—কৌন্তভ রত্ন ধর্ম রত্নাকরে !

কি শক্তি এ মহামন্ত্রে ! কিবা সংস্কার
 নিহিত শিশুর চিত্তে, কলিকা কমলে
 গুপ্ত পরিমল যথা ! আকুল উচ্ছাস
 থাকে গুপ্ত যথা মহা জলধির জলে ।
 শ্রবণের পথে মন্ত্র প্রবেশি হৃদয়ে,
 আগাইল হৃদয়ে কি নিদ্রিত উচ্ছাস !
 নাচিতে লাগিল শিশু দুই বাহু তুলি,
 শিশু অঙ্গে স্বেদ কম্প পুলক প্রকাশ !
 খুলিল স্তানের নেত্র গায়ত্রী পরশে,
 খোলে দিবসের নেত্র পরশে উষার
 নিম্নল প্রভাতে যথা । তৃতীয় নয়ন
 লভিয়াছে ; পূর্ণ উপনয়ন তাহার !
 করে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি, গৈরিক বসন,
 নাচে শিশু উৰ্দ্ধনেত্র, গায় হরিনাম ,
 আবেগে মুচ্ছিত হয়ে পড়িতে ভুতলে,
 লইলেন অন্ধে জগন্নাথ পুণ্যবানু ।
 দর্শক, ব্রাহ্মণগণ ভক্তিতে অধীর,
 করে উচ্চে হরিধ্বনি, গায় নাম গান ।
 কি আনন্দ শিশু মুখে ! শিহরি মুচ্ছায়
 কহিল—“বাবা ! মা ! আমি যাই নিজস্থান ।”

“নিজ স্থান !”—জগন্নাথ উঠিলা শিহরি ।

“নিজ স্থান”—জগন্নাথ দেখিলা স্বপন—

আগে যায় বিশ্বরূপ, পশ্চাতে নিমাই,

অদ্বুত সন্ন্যাসী বেশে ভাই দুই জন ।

কোটি কোটি নর নারী, ভক্তিতে বিহ্বল,

আনন্দে বেড়িয়া নাচে করিয়া কীর্তন,

পবিত্র বিষ্ণুর খাটে বসাইয়া কভু

পূজিতেছে নিমাইর পবিত্র চরণ !”

কি পবিত্র দৃশ্য ! হাসে অক্কেতে মূর্চ্ছিত

পতিত-পাবন শিশু, নেত্রে অশ্রুজল !

মূর্চ্ছিত জনক, ধারা পতিত-পাবনী

যুগল কপোল বাহি বহে অবিরল !

* * * * *

কি পবিত্র দৃশ্য ! হায় ! দেখিয়াছি আমি

এ দৃশ্য প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে একদিন ।

আমার নিমাই * উপনয়নে তাহার

সেজেছিল এই রূপে সন্ন্যাসী নবীন ।

* আমার ‘নির্মলকে’ আমার একটি বন্ধুর পুত্র ‘নিমাই’ বলিয়া ডাকিত ।
আমার পুত্রপ্রতিম সেই বন্ধুপুত্র ৮ হুশীলকুমার বহু আজ স্বর্গে । তাহার নিজের

চতুর্থ সর্গ ।

করে দণ্ড ; কাঁধে বুলি ; মুণ্ডিত মস্তক ;
গৈরিকে কিশোর অঙ্গ করুণ-সজ্জিত ।
এইরূপে উৰ্দ্ধনেত্রে ভক্তিতে সজ্জল,
গেয়েছিল কি মধুর হরিনাম গীত ।
দেখিয়া সন্ন্যাসী-শিশু, শুনিয়া কীর্তন,
হয়েছিল দর্শকেরও নয়ন সজ্জল ।
এইরূপে হায় ! আমি লয়ে বুকে তারে,
হয়েছিলু আত্মহারা প্রেমেতে বিহ্বল ।
আজি সে নিমাই মম সন্ন্যাসে সুদূর,
জনক জননী ছাড়ি, ছাড়ি জন্মভূমি !
হে সন্ন্যাসী শিশু ! তারে দিয়ে পদছায়া
কঠোর সন্ন্যাস তার পূর্ণ কর তুমি !

* * * *

গিয়াছেন বিশ্বরূপ । একি স্বপ্ন হায় !
দেখিলেন অগ্নীপথ !—বাইবে নিমাই ?
একি ভাব নিমাইয়ের ? নিমাই ! নিমাই !
বৃদ্ধ অগ্নীপথের ত লক্ষ্য আর নাই ।

চরিত্রও একটি দেবশিশুর মত ছিল । জানিনা শ্রীভগবান তাহার মনে এ পবিত্র
উচ্ছ্বাস এবং তাহার মুখে এ মধুর নাম কেন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন ।

বসিয়া পূজায় বৃদ্ধ কহিলা কাঁদিয়া—

“হায় ! এই ইচ্ছা যদি তব নারায়ণ !

নিয়াছ সকল ; ছিল যে দুইটা ফল,

তাহাও কি এইরূপে করিবে হরণ ?

জানি এ নিয়তি উচ্চ । উচ্চতর আর

নাই মানবের ভাগো । হউক সফল

পুত্রের নিয়তি, পুণ্য নিয়তি পিতার ।

আত্মা দৃঢ়, কিন্তু নাথ ! শরীর দুর্বল !

পড়িবে ভাঙ্গিয়া দেহ । হইবে আকুল

রক্ত মাংস জ্ঞানহীন । ঘটিবে বৃদ্ধার

অপমৃত্যু মহাশোকে, ঘটিবে বৃদ্ধের ;

হইবে না উভয়ের অস্তিম সংকার ।

দেও আগে উভয়েরে চরণে তোমার

ক্ষুদ্র স্থান ! নেও তবে পুণ্য পথে তার

শেষ পুত্রে আগে আগে পথ দেখাইয়া,

মরুভূমে ভক্তি গঙ্গা করিয়া সঞ্চার ।”

অরে জরাজীর্ণ দেহ পড়িল ভাঙ্গিয়া

জনকের ; উপস্থিত অস্তিম সময় ।

গেছে ভ্রাতা ; যায় পিতা ; হইয়া আকুল

পড়িল ভাঙ্গিয়া শিশু কোমল হৃদয় ।

পিতার চরণ তলে কহিল কাঁদিয়া

পুত্র শোকাকুল—“বাবা ! শিশু নিরাশ্রয়
কারে সমর্পিয়া, যাও সমর্পিয়া কারে

অভাগিনী মা আমার কোমল হৃদয় ?
কে দিবে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল

এ অনাথা মাতা পুত্রে ? এক বিন্দু জল,
না দিহু একটি অন্ন বদনে তোমার,

নিমাইর নর জন্ম হইল বিফল ।”

হরিভক্ত জগন্নাথ কহিলেন ধীরে—

“নিমাই ! তোমার হরি অনাথের নাথ ।

তোমাদেরে সমর্পিয়া চরণে তাঁহার

চলিলাম, সে চরণে করি প্রণিপাত ।

পুত্র বিশ্বরূপ, পুত্র নিমাই যাহার,

অবশ্য সে পাদ পদ্যে পাবে ক্ষুদ্র স্থান ।

ক্ষুদ্র জীবে দিবে অন্ন—নিয়তি তোমার

নহে এত ক্ষুদ্র ; তব নিয়তি মহান !”

অর্দ্ধ নাতি গঙ্গাজলে মুদিল নম্রন

জনক, তারকত্রয় মুখে হরি নাম ।

“হরিবোল ! হরিবোল !”—বলিয়া নিমাই

নিমজ্জিত পিতৃ পদে পড়িল—অজ্ঞান ।

অমৃতভ ।

* * * *

নিমাই ! নিমাই ! তুমি নর নারায়ণ ।

তোমার এ শোক যদি ; সাস্থনা আমার
আছে কোথা ধরাতলে ? হায় ! এ জীবনে
পাই নাই ; পাইব না এ জীবনে আর ।

আমিও একটি অন্ন, এক বিন্দু জল,
দিব পিতৃপদে তাগ্যে ছিল না আমার ।
ছিল না—অস্তিমে পিতৃ মাতৃ পদে হায় !

ছুটি বিন্দু অশ্রুও যে দিব উপহার ।
তুমি নর-নারায়ণ । নিয়তি তোমার
কত উচ্চ ! ক্ষুদ্র জীব সাস্থনা আমার
আছে কিবা ? কাঁদিয়াছি একটি জীবন ;
আজি দর দর অশ্রু বহে অনিবার ।





পঞ্চম সর্গ ।

চঞ্চল পণ্ডিত ।

ছাদশ বর্ষীয় শিশু, আশ্রয় বিহীন ।
গিয়াছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । পিতা বৃদ্ধ দীন
গেলেন অনন্ত ধামে । মাতা বৃদ্ধা দীনা
পুত্র শোকে, পতি শোকে সন্তপ্তা মলিনা ।
হৃদয়েতে বিপ্লবের ছায়া ঘোরতর
হইল পণ্ডিত ; শিশু হইল কাতর ।
সে চাঞ্চল্য, সেই ক্রীড়া, হইল অন্তর ।
হইল হৃদয় স্থির শাস্ত সরোবর ।
হাসির জ্যোৎস্না মাখা ক্রীড়ার হিলোল
লুকাইল, লুকাইল কোতুক কল্লোল ।

কর্তব্যের গুরুছায়া হৃদয় গগণে
ভাসিল, গাস্তীৰ্য্য ছায়া ভাসিল বদনে ।
পড়িলেন টোলে গঙ্গাদাসের প্রথম ।
সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ, পণ্ডিত পরম
‘তত্ত্বসার’ রচয়িতা । সহপাঠী আর
পণ্ডিত কমলাকান্ত, অলঙ্কার ঘাঁর
খ্যাতি অদ্বিতীয়, গুপ্ত মুরারি সহিত ।
বয়োবৃদ্ধ ছাত্রগণ হইয়া বিস্মিত,
বালকের প্রতিভায় কহিত কখন—
“নিমাই ! মানুষ তুমি নহে কদাচন ।”
সার্কভৌম বাসুদেব, বঙ্গরত্নোত্তম,
ভগীরথ মত যিনি আনিল প্রথম
শ্রাবণগঙ্গা নবদ্বীপে, টোলেতে যাহার
“দীধিতির” * রঘুনাথ করি অধ্যয়ন
লভিলা অমর কীর্তি ; পদতলে তাঁর
করিলেন বিশ্বস্তর শ্রায় অধ্যয়ন
প্রতিভার রঘুনাথে করিয়া স্তুতি ।
বর্ষসপ্ত এই রূপে করি অধ্যয়ন,

* বনামখ্যাত শ্রাবণগঙ্গ ।

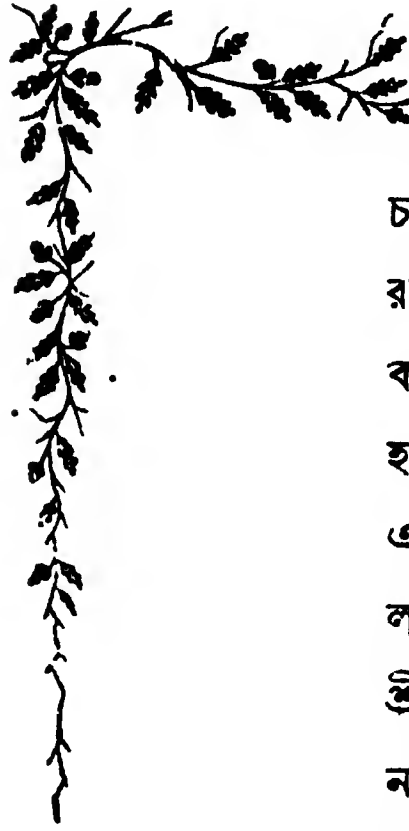
হইলেন অধ্যাপক, পণ্ডিত নিমাই,
 আলোকিল বঙ্গ কীর্তি কৌমুদী তাঁহার ।
 নিমাই ও রঘুনাথ একদা উভয়ে
 হ'তেছেন গঙ্গাপার । কহে রঘুনাথ—
 “ভাই বিশ্বস্তর ! হাতে কি গ্রন্থ তোমার ?”
 ‘ভায় গ্রন্থ স্বরচিত’—শুনিয়া উত্তর
 হইলেন রঘুনাথ মলিন বদন ।
 চাহিলে শুনিতে গ্রন্থ, লাগিলা পড়িতে
 অনিচ্ছায় বিশ্বস্তর । বিশ্বয়ে নিমাই
 দেখিলা যতই গ্রন্থ করিছে শ্রবণ
 ততই শ্রোতার মুখ হতেছে মলিন ।
 জিজ্ঞাসিলে হেতু তার, কহিলেন খেদে
 রঘুনাথ—“বিশ্বস্তর ! বহু পরিশ্রমে
 করিয়াছি প্রণয়ন এক গ্রন্থ আমি ।
 কিন্তু ভাই ! এই গ্রন্থ থাকিতে তোমার,
 আমার ‘দীপ্তি’ কেহ পড়িবে কি আর ?
 কে ছাড়ি জ্যোৎস্না চাহে আলো জোনাকির ?
 চাহে কুপোদক ছাড়ি বারি জাহ্নবীর ?”
 সে মুহূর্ত্তে বিশ্বস্তর গ্রন্থ আপনার
 করিলেন বিসর্জন গর্ভেতে গঙ্গার ।

“কি করিলে ! কি করিলে !”—কহি উচ্চৈঃস্বরে
 চাহিলেন রঘুনাথ করিতে উদ্ধার ।
 হইয়া নিষ্ফল-যত্ন, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
 রহিলেন রঘুনাথ যেন চিত্রার্পিত,
 চাহি বিশ্বস্তর পানে । হাসিয়া নিমাই
 কহিলেন—“বথা খেদ কর তুমি ভাই !
 ভক্তিহীন ত্রায়শাস্ত্র মরুর সমান,
 ভক্তিগঙ্গা গর্ভে তাঃ উপযুক্ত স্থান ।”

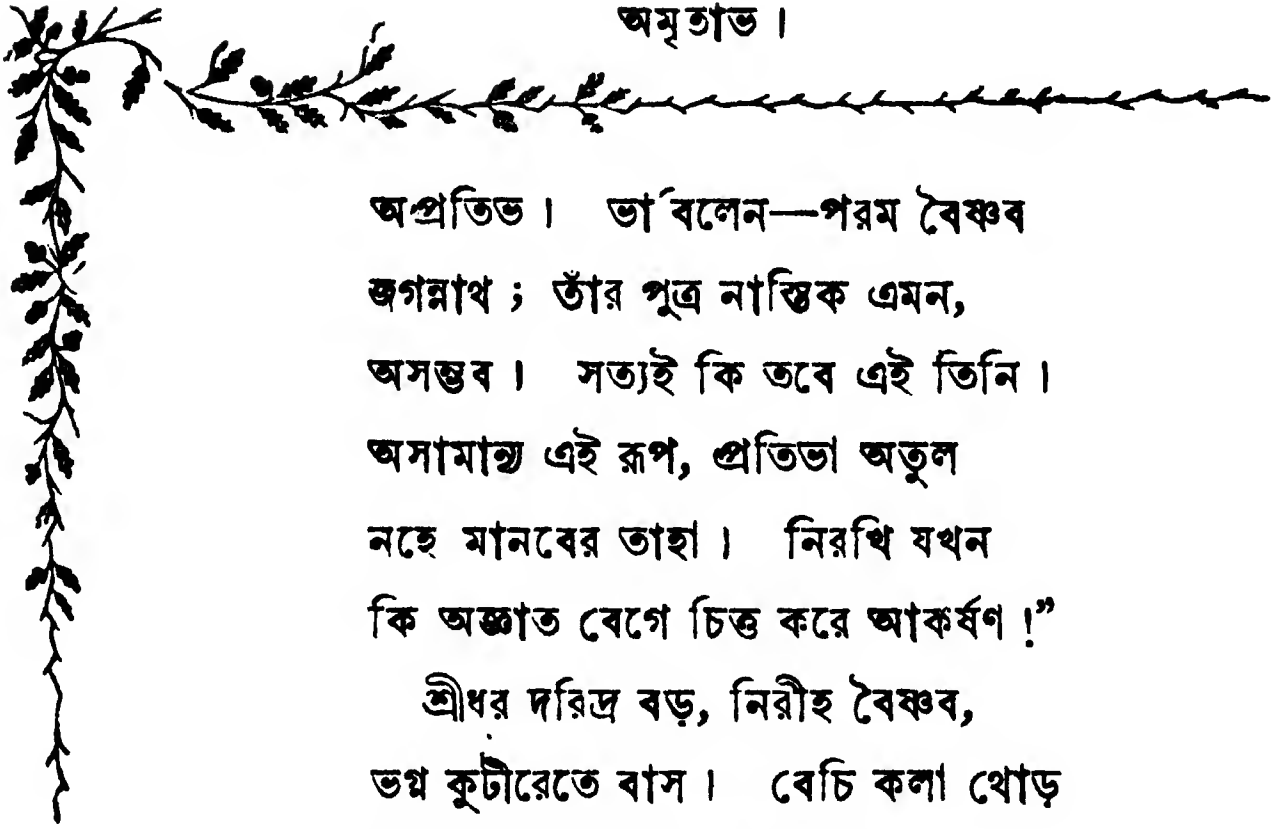
মুকুন্দ সঞ্জয় অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ
 নবদ্বীপে ; চাক্র চণ্ডীমণ্ডপে তাহার
 খুলিলেন চতুষ্পাঠী । দেখিতে দেখিতে
 বহু ছাত্রে চতুষ্পাঠী হইল পুরিত ।
 ‘নিমাই পণ্ডিত’—কীর্ত্তি কণ্ঠে শত শত
 করিল প্রচার ক্রমে দিকদিগন্তরে,
 শচীর আনন্দ আর ধরে না অন্তরে ।
 পুত্র কণ্ঠে সরস্বতী, আনিলেন ঘরে
 নাম ‘লক্ষ্মী’, লক্ষ্মীবধু গৃহ আলো করি
 বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরমা সুন্দরী ।
 বহুদিন পরে বৃদ্ধা জননীর মুখে
 ভাসিল আনন্দ হাসি ; বহুদিন পরে

উথলিল সুখ-সিদ্ধ জননীর বুকে ।
 অধ্যয়নে অধ্যাপনে কাটাইয়া দিন,
 অপরাহ্নে করে পুত্র নগর ভ্রমণ,—
 গলার ফুলের মালা, ললাটে চন্দন,
 চন্দনে চিত্রিত বক্ষ, সুবর্ণ দর্পণ ।
 পরিধান পট্টবস্ত্র, হাসি ভরা মুখ,
 হৃদয়ে তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিছে কোতুক ।
 সে তরঙ্গ মুখে পড়ে পূর্ববঙ্গ যদি,
 তবে তার লাজনার না থাকে অবধি ।
 বিশেষ বৈষ্ণব কেহ পড়িলে সম্মুখে
 বিষম আতঙ্ক ত্রাস উঠে তার বুকে ।
 যাইছে মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রামবাসী,—
 বৈদ্যাসুত পিককণ্ঠ । পরম বৈষ্ণব,
 বর্ষে স্মৃধা সঙ্কীর্ণনে অদ্বৈত সভায় ।
 কোতুকীর চুড়ামণি নিমাই পণ্ডিত
 দেখিয়া সন্নিধ্য, ভয়ে মুকুন্দ সরিয়া
 পলাইছে, শিষ্যগণ ধরিল তাহার ।
 জিজ্ঞাসে নিমাই—“কেন দেখিয়া আমারে
 পলাইলু এইরূপে ?”—পূর্ববঙ্গ ভাষা
 অনুকারি সকৌতুক । মুকুন্দ নির্বাক ;

শুক মুখ ; যেন মৃত্যু সন্মুখে তাহার ।
 হাসে খল খল শিষ্য ; হাসিয়া নিমাই—
 “পড়িস্ বৈষ্ণব শাস্ত্র, ভাবিন্ আমারে,
 পাষণ্ড, শাস্ত্রের বৃথা করি কচ্কচি ।
 দেখিলে আমারে তাই বাস্ পলাইয়া ।
 কিন্তু তুই পারিবি না পলাইতে কভু
 ছাড়ায়ে আমার হাত । কিছু দিন পরে
 হইবি আমার তুই । এমন বৈষ্ণব
 হইব আমিও আর কিছু দিন পরে,
 হইবেন সদাশিব দ্বারস্থ আমার ।”
 মুকুন্দ এ উপহাসে মহা ক্রোধান্বিত
 কহিল—“পণ্ডিত ! তুমি কি ঘোর নাস্তিক !
 মহাদেবকেও তুমি কর উপহাস ।”
 মুকুন্দ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান,
 চলিল সক্রোধে, শিষ্য উঠিল হাসিয়া ।
 শ্রীবাস পিতার বন্ধু, গৃহিণী মালিনী
 জননী প্রিয় সখী । একদা শ্রীবাস
 এইরূপে বিশ্বস্তুরে দেখি রাজপথে
 ক্রীড়াশীল, জিজ্ঞাসিলা উপহাস করি—
 “উদ্ধতের শিরোমণি ! যাইছ কোথায় ?”



চাপিয়া কোতুক হাসি, করি নমস্কার,
 রহিলেন অধোমুখে নিমাই সম্মুখে ।
 কহিলা শ্রীবাস—“দেখ নিমাই এখন
 হয়েছ পণ্ডিত তুমি । বল এ কোতুক,
 এইরূপ চপলতা শোভে কি তোমারে ?
 লভিছ কি ফল বিদ্যা চর্চায় কেবল,
 শ্রীকৃষ্ণ ভজনা বিনা জীবন বিফল ।
 নারিকেল শস্য স্বাদ্ধ ধবে সুধাজল ;
 খোসার চর্ষণ মাত্র নিষ্ফল কেবল ।”
 কপট গস্তীর ভাবে করিলা উত্তর
 নিমাই—“বালক আমি । আরো কিছুদিন
 পড়িয়া বৈষ্ণব আমি হইব এমন,
 লইবেন অজ্ঞ ভব আমার শরণ ।”
 কপট গাস্তীর্য আর না পুরি রাখিতে
 হাসিলা নিমাই । থেদে কহিলা শ্রীবাস—
 “ভাগবত জগন্নাথ । ত্রায় শাস্ত্র পড়ি
 হইলি নাস্তিক শেষে । দেবতা ব্রাহ্মণ
 নাহি কি মানিনু তুই ?” কহিলা নিমাই—
 “সোহং—আমি তিনি ; মানিব কাহারে ?”
 চলিলা নিমাই । চাহি রহিলা শ্রীবাস



অপ্রতিভ । ভাবিলেন—পরম বৈষ্ণব
জগন্নাথ ; তাঁর পুত্র নাস্তিক এমন,
অসম্ভব । সত্যই কি তবে এই তিনি ।
অসামান্য এই রূপ, প্রতিভা অতুল
নহে মানবের তাহা । নিরখি যখন
কি অজ্ঞাত বেগে চিত্ত করে আকর্ষণ !”

শ্রীধর দরিদ্র বড়, নিরীহ বৈষ্ণব,
ভগ্ন কুটীরেতে বাস । বেচি কলা খোড়
যাহা পায় করে কৃষ্ণ পদে সমর্পণ ।
নিমাইয়ের যত চোট তাহার উপর ।
নিত্য শ্রীধরের সঙ্গে কোতুক সমর ।
একদা কুটীরে দেখি উদ্ধত নিমাই
শ্রীধরের কণ্ঠ শুক । করি নমস্কার
সভয়ে আসন দিলে শিষ্য নিমাই
বসিয়া কহিলা—“দেখ নির্যোধ শ্রীধর !
অন্ন বস্ত্র দুঃখ তুমি সহ অনুক্ষণ,
ওবু লক্ষ্মীকান্ত সেবা কর কি কারণ ?”
চটিল শ্রীধর—“উপবাস নাহি করি ।
‘ছোট হোক বড় হোক বস্ত্র দেখ পরি ।’”
হাসিয়া নিমাই—“তার গিরা দশ ঠাই ।

ঘরের ত দশা এই, চালে খড় নাই ।
 চণ্ডী বিষহরি আর পূজে দেখ যারা,
 খায়, পরে, থাকে সুখে, কেমন তাহারা !”
 “কহিলে উত্তম !”—কহে শ্রীধর আবার,—
 “তথাপি সমান যায় কাল সবাকার ।
 দেখ রাজা রত্ন হস্তে গৌরবে বিহরে,
 পক্ষিগণ থাকে আর বৃক্ষের উপরে ।
 কাল কিন্তু সকলের সমভাবে যায় ।
 সমভাবে কৰ্ম্মফল ভোগে এ ধরায় ।”
 মুখেতে কপট হাসি, বিস্মিত অন্তর
 কহিল নিমাই—“বটে ! কপট শ্রীধর !
 দরিদ্রের এত শাস্তি থাকে না কখন,
 অবশ্য তোমার আছে বহু গুপ্তধন ।
 এখনই আমি তাহা করিব প্রচার ।
 প্রতারণা মাত্র এই দারিদ্র্য তোমার ।”
 “হয়েছ পণ্ডিত”—কহে কাতরে শ্রীধর,
 “এখনো চাপল্য তব হলো না অন্তর ?
 নিত্য এ কলহ ; যাও পণ্ডিত এখন,
 আমি নীচ জাতি, তুমি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ।”
 কহেন নিমাই—“ছাড়ি সহজে এমন

যাইব না । থাক্ এবে সেই গুপ্ত ধন ;
 দেও কলা খোড় মূল্যে সুলভ শ্রীধর,
 না করি কোন্দল তবে চলে যাই ঘর ।”
 শ্রীধর কহিল—“মূল্য থাকুক মাথায়,
 লও বিনামূল্যে তুমি বাহা প্রাণ চায় ।”
 “ভাল ভাল”—হাসি মৃদু কহিলা নিমাই,
 “তবে আর আমাদের স্বন্দ কিছু নাই ।”

একদা সারাহে বসি জাহ্নবীর তীরে—
 মধুর বাসন্তী সন্ধ্যা, ভাগীরথী নীরে
 ঢালিয়াছে সচঞ্চল ছায়া স্নানীতল,
 খেলিছে দক্ষিণানিলে হিল্লোল চঞ্চল ।
 গাইছে কোকিল ; গায় উড়িয়া আকাশে
 পাণ্ডিয়া মধুর কণ্ঠে ; বাসন্ত বাতাসে
 ভাসিতেছে দয়েলের কণ্ঠ উত্তরোল ।
 গাইছে পূরবী সন্ধ্যা জাহ্নবী হিল্লোল ।
 ঘাটে ঘাটে নরনারী ছাত্র অগণিত ।
 জলে স্থলে ভাগীরথী বিচিত্র পুষ্পিত ।
 বহিতেছে জীব শ্রোত জলশ্রোত মত
 বহু শ্রোতে বেলাভূমি চিত্রি অবিরত ।
 উড়িতেছে সন্ধ্যানিলে বিমুক্ত কুন্তল,

বিমুক্ত বিচিত্র চাক্র রমণী অঞ্চল ।
বামা কণ্ঠ, বালা কণ্ঠ, চাক্র উচ্চ হাসি
সায়াহু স্তোত্রের সহ উঠিতেছে ভাসি ।
নিভূতে বসিয়া এক বিটপি তলায়
নিমাই সশিষ্য সাক্ষা শীতল ছায়ায়
শৈলজার সাক্ষা শোভা করি নিরীক্ষণ
করিছেন শাস্ত্রালাপ আনন্দিত মন ।
কাশ্মীরী কেশব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,
জিনিয়া ভারত নবদীপে উপনীত ।
ভ্রমিতে গঙ্গার তীরে দেখে আচম্বিত
সশিষ্য নিমাই, চক্ৰ নক্ষত্র বেষ্টিত ।
প্রথম যৌবন, বর্ণ সুবর্ণ তরল,
কি বিশাল ছই নেত্র জ্ঞান সমুজ্জল ।
কি ললাট শাস্তি-পূর্ণ সায়াহু গগন,
কি হাসি অধরপ্রান্তে ভুবন মোহন ।
কেশব এমন রূপ দেখেনি কখন,
কেশব এমন কণ্ঠ করেনি শ্রবণ ।
কেশব এমন যুবা, গঙ্গার ধারায়
বরষিতে শাস্ত্র-জ্ঞান দেখেনি কোথায় ।
কেশব রহিল চাহি বিস্মিত, স্তম্ভিত ;

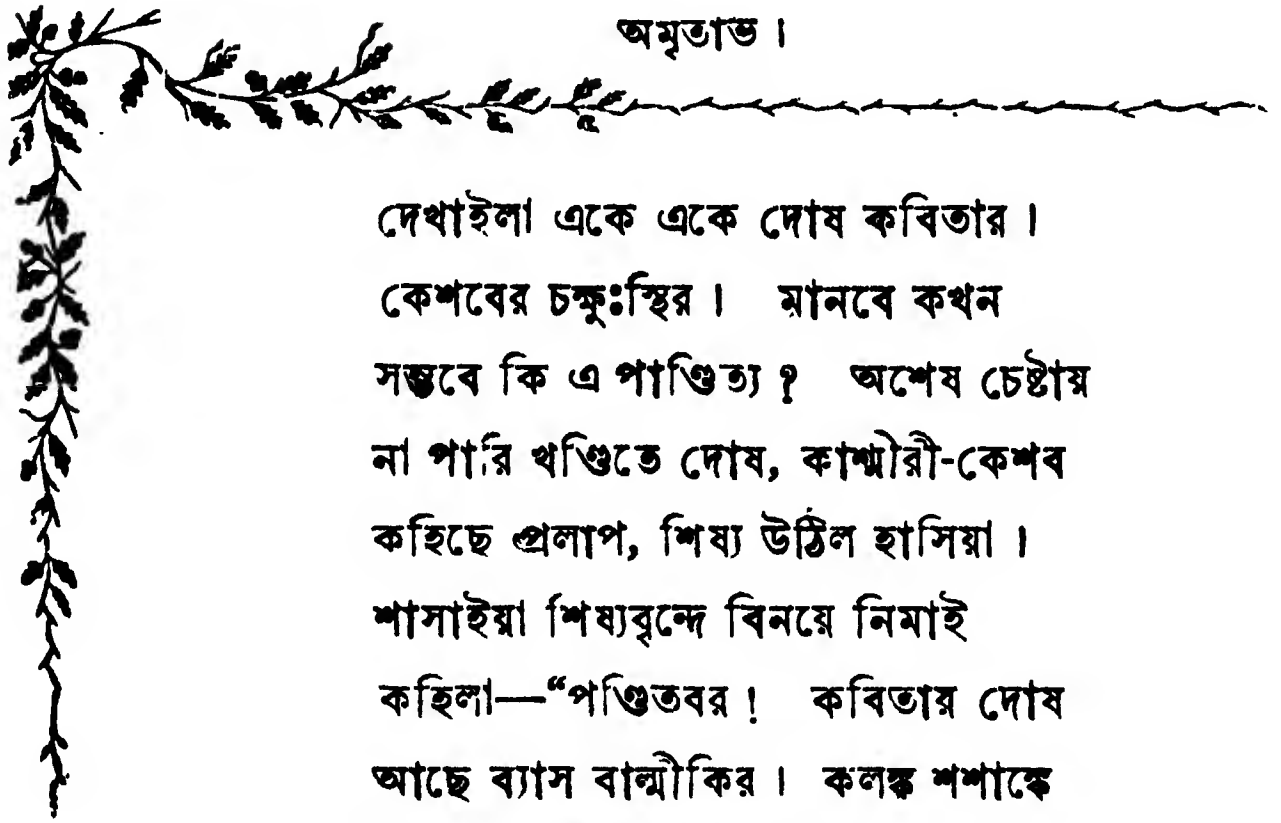
Jhikira Kodanpath Sadharan Pathagar.

Jhikira, Howrah

Phone No. Call No.

স্থির, অচঞ্চল, যেন মুরতি স্থাপিত ।
 ওকি রূপ ! আকর্ষিছে আকুল হৃদয়
 কেশব নিকটে গিয়া দিলা পরিচয় ।
 সসম্মম নিমাই করিয়া নমস্কার
 করিলেন অভ্যর্থনা । কহিলা কেশব—
 “এখনো বালক তুমি ; কিন্তু নবদ্বীপে
 শুনিতেছি ব্যাকরণে তুমি অদ্বিতীয়
 এবয়সে, মানিতেছি মনেতে বিশ্বয় ।”
 বিনয়ের প্রতিমূর্তি কহিলা নিমাই
 অধোমুখে মৃদুকণ্ঠে—“জ্ঞানে ও বয়সে
 সত্যই বালক আমি ।” চাহি গঙ্গা পানে—
 “বড় সাধ মনে শুনি মহিমা গঙ্গার
 ভারত বিজয়ী মহা পণ্ডিতের মুখে ।”
 শুক্লপক্ষ ; শশধর হাসিছে আকাশে ;
 জ্যোৎস্না জাহ্নবী বক্ষে কি লীলা প্রকাশে ।
 কেশব কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় সুন্দর
 রচিল গঙ্গার স্তব । ঝটিকার বেগে,
 জলদ গভীর স্বনে ধারা কবিতার
 বহিল কেশব কণ্ঠে জাহ্নবী ধারায়,
 কবিত্তে পাণ্ডিত্যে করি বিন্মিত সকল ।

কহিল নিমাই ধীরে—“জগতে দুর্লভ
এ কবিত্ব, অমানুষী শক্তি আপনার ।
বিনীত বাসনা মনে করিয়া শ্রবণ
দোষগুণ কবিতার, করিব গ্রহণ
কবিতার রসসুখা লীলা কল্পনার ।”
“দোষ !”—জতুগৃহ মত উঠিল জলিয়া
দিগ্বিজয়ী অভিমান । কহিল সক্রোধ—
“ব্যাকরণ, শিশু শাস্ত্র পড়িয়াছি তুমি ;
পড় নাই অলঙ্কার । কবিতার রস,
কেমনে বুঝিবে তুমি । বধির কেমনে
বুঝিবে সঙ্গীত সুখা ? ইন্দ্রধনু-শোভা
দেখিবে জন্মাক ?” শুনি ঈষদ হাসিয়া
কহিল নিমাই—“পড়ি নাই অলঙ্কার ।
কিন্তু শুনিয়াছি আমি দেবী বীণাপাণি
বিরাজেন নবদ্বীপে । কবিতার সুখা
ভাসে জাহ্নবীর স্রোতে, হাসে চন্দ্রকরে,
মৃদু মন্দানিলে বহে, মর্ম্মরে পাতায়
তরুলতা নবদ্বীপে কবিতার রস
পারে বুঝিবারে, পারে করিতে বিচার ।”
অপূর্ব-প্রতিভা বলে, নিমাই তখন,



দেখাইলা একে একে দোষ কবিতার ।
 কেশবের চক্ষুঃস্থির । মানবে কখন
 সম্ভবে কি এ পাণ্ডিত্য ? অশেষ চেষ্টায়
 না পারি খণ্ডিতে দোষ, কান্দারী-কেশব
 কহিছে প্রলাপ, শিষ্য উঠিল হাসিয়া ।
 শাসাইয়া শিষ্যবৃন্দে বিনয়ে নিমাই
 কহিলা—“পণ্ডিতবর ! কবিতার দোষ
 আছে ব্যাস বাল্মীকির । কলঙ্ক শশাঙ্কে
 আছে, কিন্তু তবু চন্দ্র কত মনোহর !
 মহাভাগ্যবলে কবি, আছে আপনার
 সে কবিত্ব, মর-লোকে কবিই অমর ।
 হয়েছে অধিক রাত্রি, ক্লান্ত দেহ মন
 আপনার, গৃহে এবে করুন গমন ।”

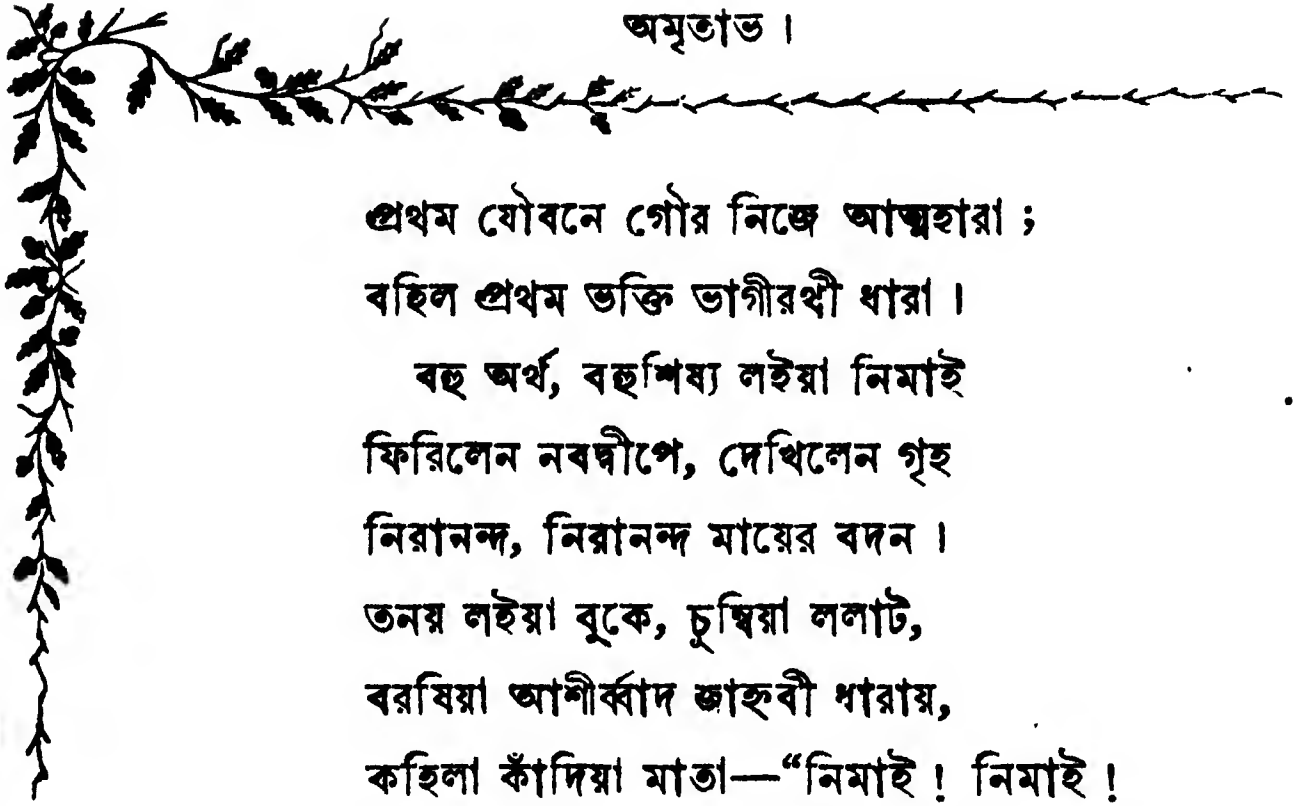
সারানিশি অনিদ্রায় সম্ভ্রান্ত কেশব
 ভাবিলেন—“এ যুবা কে ? পাণ্ডিত্য এমন,
 এ নদ্রতা, এ বিনয়, নহে মানুষের ।
 এই বিনয়ের কাছে অভিমান তাঁর,
 তাঁহার বিদ্যার দস্ত, দস্ত ঐশ্বর্যের,
 কত তুচ্ছ, কত হীন ! কত স্বপ্ন আর
 দেখিলেন দিগ্বিজয়ী । প্রজাতে উঠিয়া

শচীর কুটিরে গিয়া, শচীর কুমায়ে
করিলেন আলিঙ্গন । আতপ তাপিত
পথিক পাইল যেন ছায়া স্নানীতল ।
কি বৈরাগ্য প্রাণারাম হইল সঞ্চার
কেশবের হৃদয়েতে । ঐশ্বর্য্য তাঁহার—
হয়, হস্তী, বহুমূল্য বসন ভূষণ
ছিল যাহা সঙ্গে, সব করি বিতরণ,
গেলেন চলিয়া, করি সন্ন্যাস 'গ্রহণ' ।
উঠিল নদীয়া ব্যাপী ঘোর আন্দোলন ।

পুণ্যবান পিতৃস্থান দেখিতে নিমাই
গেলেন শ্রীহটে, পূর্ব্ববঙ্গে পুণ্যবতী ।
দেখিলেন পূর্ব্ববঙ্গ শস্য স্ত্রীশ্রামলা
অন্নপূর্ণা জগতের ; মহাৱজভূমি
পদ্মা মেঘনার, শ্রাম পর্ব্বত মালার ;
সন্মিলন ক্ষেত্র ব্রহ্মপুত্র শৈলজার ।
বিশাল হৃদয়া পদ্মা দেখিলা নিমাই,
দিগন্ত ব্যাপী মেঘনা, নীলাম্বুতে ভরা,
বাসন্ত আকাশ তলে জীবদ চঞ্চলা ।
উপরে সুনীলাকাশ ; নিম্নে নীলাময়
অনন্ত সলিল নীল । দেখিলা নিমাই

নৃত্যশীল নীলমণি ; নূপুর নিনাদ
 সলিলে কল্লোল মৃদু ; সুধায় পূরিত
 বেগুরব বসন্তের অনিল নিশ্বন ।
 যৌবন চাঞ্চল্যে সুপ্ত ভক্তির অঙ্কুর
 উঠিল জাগিয়া ধীরে, জীবনে প্রথম ;
 জাগিয়া উঠিল সুপ্ত কি পূর্ব স্বপন !
 নিরখিল পূর্ববঙ্গ বিমোহিত প্রাণ—
 একি রূপ অলৌকিক ! কাঞ্চনে রঞ্জিত
 সুদীর্ঘ ত্রিভঙ্গ তনু । কিবা দেব মুখ,
 কি ললাট দেবত্বের প্রভাত গগণ ;
 আরক্ত, সজ্জল, পদ্ম পলাশ লোচন !
 প্রথম যৌবনে কিবা পাণ্ডিত্যের শেষ,
 কণ্ঠে সরস্বতী বসে মুখে কৃষ্ণ নাম ।—
 ভাবগ্রাহী পূর্ববঙ্গ ভাবেতে বিভোর
 চিনিগ এ নহে নর ; পড়িল লুটায়
 পাদপদ্মে, কৃষ্ণ নামে উঠিল মাতিয়া ।
 পণ্ডিত তপন মিশ্র দেখিল স্বপন—
 নিমাই মামুষ নহে নর-নারায়ণ ।
 পড়িয়া চরণে বিপ্র কহে—“কৃপা করি,
 তরিবারে এ সংসারে দেও পদতরি ।

বিষয় আমার হয় বিষ সম জ্ঞান,
 কহ দয়াময় কিসে জুড়াইবে প্রাণ ।
 সাধ্য কে, সাধনা কিবা, কিছুই না জানি ।
 কহ কৃপা করি কিসে শাস্তি পাব আমি ।”
 কহেন নিমাই—“জ্ঞান অতীত ঈশ্বর,
 হুহুহ সাধনা তাঁর, ক্ষুদ্র জীব নর ।
 যাও গৃহে এক মনে কর কৃষ্ণ ধ্যান,
 “ভক্ত কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম ।”
 কলিযুগে যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল সকল,
 হরি নাম গান মাত্র সাধনা কেবল ।”
 মিশ্র কহে—“নহে আমি গৃহের প্রয়াসী ।”
 নিমাই কহেন—“তবে যাও তুমি কাশী ।”
 উচ্ছ্বাসে অধীর বিপ্রে দিলা আলিঙ্গন ।
 “হরিবোল” বলি নাচি চলিল ব্রাহ্মণ ।
 “হরিবোল ! হরিবোল !”—নর নারীগণ
 গাইল অঙচি গুচি চঙাল ব্রাহ্মণ ।
 ভাবগ্রাহী পূর্ব বঙ্গ, হৃদয় কোমল
 পদ্মার বেগের মত আবেগ-প্রবল ।
 জ্ঞান-গুহ নবদ্বীপ ; পুলিনে পদ্মার
 করিলেন ভক্তি ধর্ম প্রথম প্রচার



প্রথম যৌবনে গৌর নিজে আশ্বহারা ;

বহিল প্রথম ভক্তি ভাগীরথী ধারা ।

বহু অর্থ, বহুশিষ্য লইয়া নিমাই
ফিরিলেন নবদ্বীপে, দেখিলেন গৃহ
নিরানন্দ, নিরানন্দ মায়ের বদন ।
তনয় লইয়া বুকে, চুসিয়া ললাট,
বরষিয়া আশীর্বাদ জাহ্নবী ধারায়,
কহিলা কাঁদিয়া মাতা—“নিমাই ! নিমাই !

আমার সে লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মী বধু নাই ।

কাল সর্পে না খাইয়া দুঃখিনী আমার,

খাইল আমার সেই স্বর্ণ প্রতিমায় ।

শুনিয়াছি আছে মণি মস্তকে তাহার ।

সে কেন হৃদয় মণি হরিল আমার ?

নামে লক্ষ্মী, রূপে লক্ষ্মী, গুণে নিরুপমা,

নাহি নবদ্বীপে মম বধুর তুলনা ।

উষাকালে উঠি বধু গৃহ কর্ম যত,

কেমন সুচারু রূপে করিত নিয়ত ।

করিত ঠাকুর ঘরে স্বস্তিক মণ্ডলী ।

লিখিত সে শঙ্খ চক্র ভক্তিতে উছলি ।

ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প সুবাসিত জল,

দেবতা পূজার সজ্জা করিত সকল ।
 তুলসীকে দিত জল, করিত যতন ।
 আমার করিত সেবা কণ্ঠার মতন ।
 বিষে জর্জরিত অঙ্গে চরণে পড়িয়া
 ননীর পুতুল মম কহিল কাঁদিয়া—
 “বড় দুঃখ রহিল মা ! তোমার চরণ
 না সেবিলু, না সেবিলু বৈষ্ণব কখন ।
 মৃত্যুকালে না দেখিলু চরণ তাঁহার ।
 পুরিল না কোনও সাধ মাগো বালিকার ।”
 কাঁদিয়াছে নবদ্বীপ করুণায় তার ।
 নিমাই ! গৃহের আলো নিবেছে আমার ।”
 বড় কাঁদিলেন শচী ; কাঁদিয়া নিমাই
 কহিল—“নিয়তি মাতঃ ! কারো সাধ্য নাই
 লজ্জাবে জগতে, শোক কর পরিহার ।
 তোমার গৃহের দীপ ইচ্ছায় আপন
 জ্বলিতে, নিবিতে মাগো ! পারে কি কখন ।
 জালাও, নিবাও তুমি কার্যে আপনার ;
 আমরা তেমনি দীপ বিশ্ব-নিয়ন্তার ।
 স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা যেই পূণ্যবতী
 পায়, তার মত কেহ নাহি ভাগ্যবতী ।”

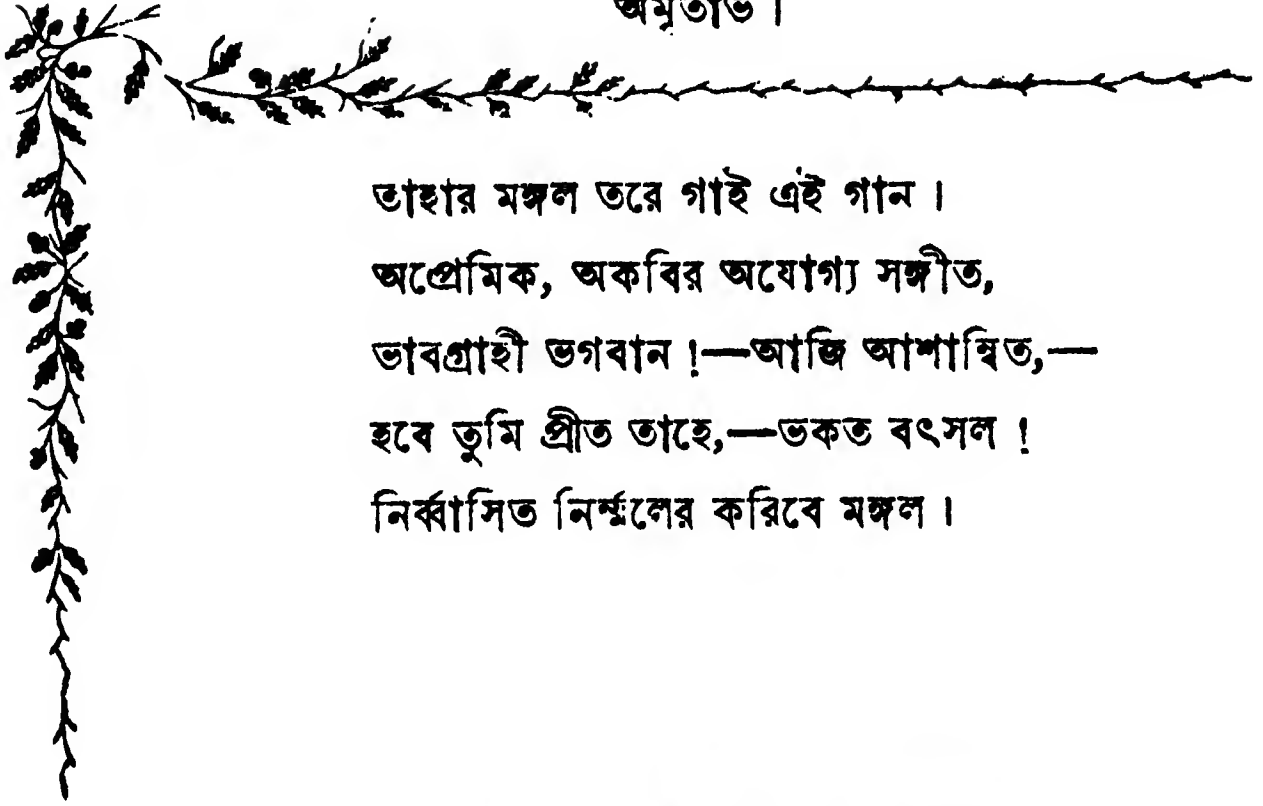
অসিলা ঈশ্বরপুরী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী
পূর্বাশ্রম কুমার হট্ট, মূর্তি প্রেম রাশি ।
গুরু মাধবেন্দ্রপুরী, করি পরিহার
জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গে “আদি সূত্রধার” *
গুরুর ‘গোপাল’ মন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বর
মুখে কৃষ্ণনাম, চিত্তে কৃষ্ণ নিরন্তর ।
একদা গৌরাজ্ঞে পথে দেখি পুরীবর
রহিলা চাহিয়া রূপ বিমুগ্ধ অন্তর ।
নিমাই নমিয়া কহে স্নকণ্ঠে বীণার—
“আজি ভিক্ষা হবে প্রভু! গৃহেতে আমার ।”
শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্য শচী দিলা ভক্তিভরে,
ভিক্ষা অস্ত্রে পুরী, প্রেম গদগদ স্বরে,
কহিতে লাগিল কৃষ্ণকথা নিরমল,
কহিতে কহিতে প্রেমে হইল বিহ্বল ।
গাইল মুকুন্দ কৃষ্ণ লীলামৃত গীত,
ঢলিয়া পড়িল পুরী হইয়া মূচ্ছিত ।
বহিছে নয়নে দুই ধারা অবিরল
হইলা নিমাই ভক্তি উচ্ছ্বাসে চঞ্চল ।
পূর্ববঙ্গে যেই ধারা হইল উচ্ছিত,

* সাহিত্য পত্রিকা : ২৮ সংখ্যা, ৭০৮ পৃষ্ঠা ।

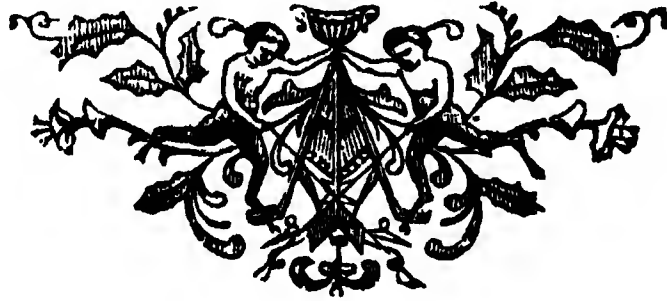
হইল তাহাতে নব সলিল সিঞ্চিত ।
 ত্রায়শুক নবদ্বীপে সেই ক্ষীণ ধারা
 শুকাইবে এ সময়ে, হবে আত্মহারা ।
 মরুভূমে বারি বিন্দু যায় শুকাইয়া
 রাখিলেন নিমাই এ উচ্ছ্বাস চাপিয়া ।
 পুরীর রচিত কাব্য “কৃষ্ণলীলামৃত”
 পড়িয়া শুনায় পুরী ভক্তি উদ্বেলিত ।
 কহিলা—“পণ্ডিত ! যদি থাকে কোন দোষ,
 কহ দয়া করি, পাব পরম সন্তোষ ।”

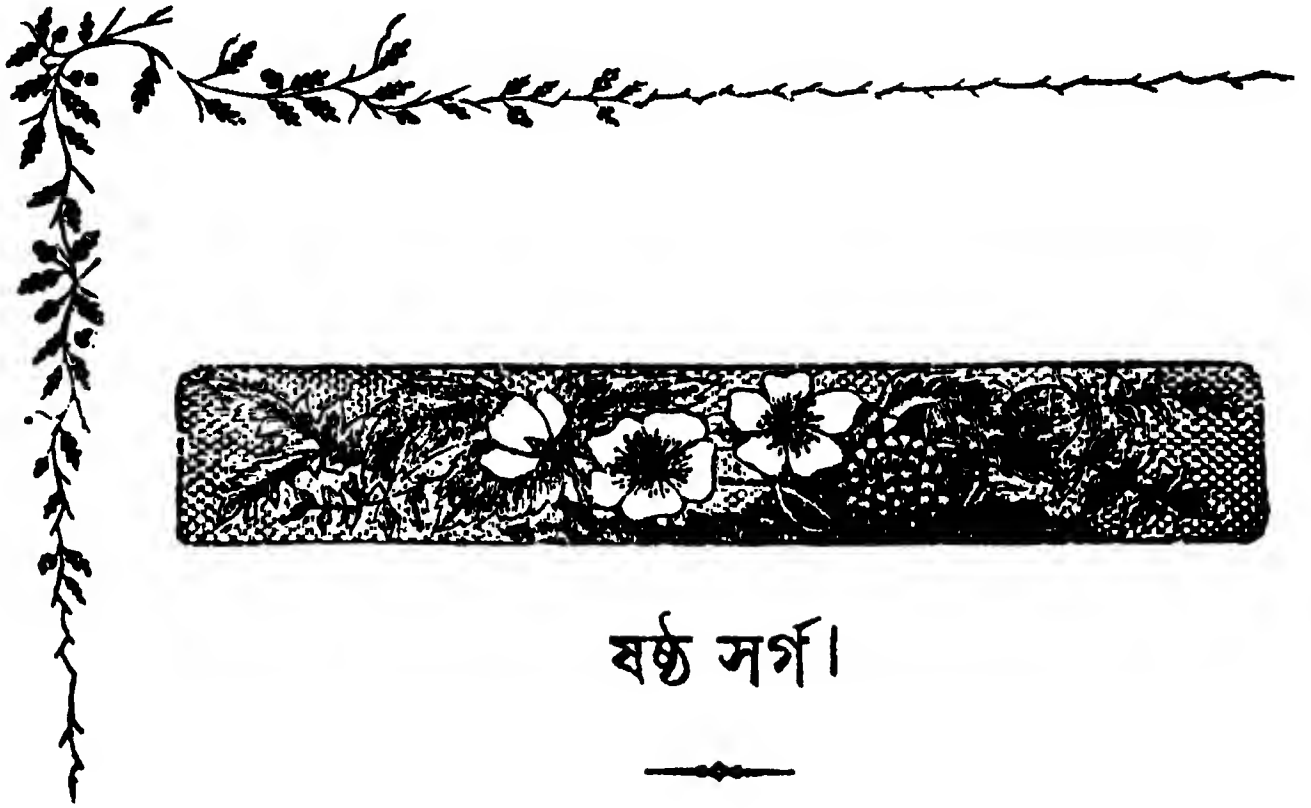
“ভক্ত বাক্য, কৃষ্ণলীলা”—কহিলা নিমাই
 তারে দিবে দোষ, পাপী ধরাতলে নাই ।
 ভক্তের কবিত্ব প্রভু ! হউক যেমন
 তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি হয় সর্বক্ষণ ।
 মূর্থ বলে ‘বিষয়, বিষয়ে’ সে বিদ্বান,
 ভাবগ্রাহী কৃষ্ণ প্রীত উভয়ে সমান ।”

কি আশার কথা ! কিবা সান্ত্বনা আমার !
 হৃদয়ে কি শক্তি, শাস্তি, হইল সঞ্চার !
 আমারো কবিত্ব নাই, নাহি ভক্তি আর
 অমৃতভ ! প্রেমলীলা চিত্রিতে তোমার ।
 দূর নির্বাসনে নাথ ! একই সন্তান,



তাহার মঙ্গল তরে গাই এই গান ।
অপ্রেমিক, অকবির অযোগ্য সঙ্গীত,
ভাবগ্রাহী ভগবান !—আজি আশাব্রিত,—
হবে তুমি প্রীত তাহে,—ভকত বৎসল !
নির্বাসিত নিষ্ঠুরের করিবে মঙ্গল ।

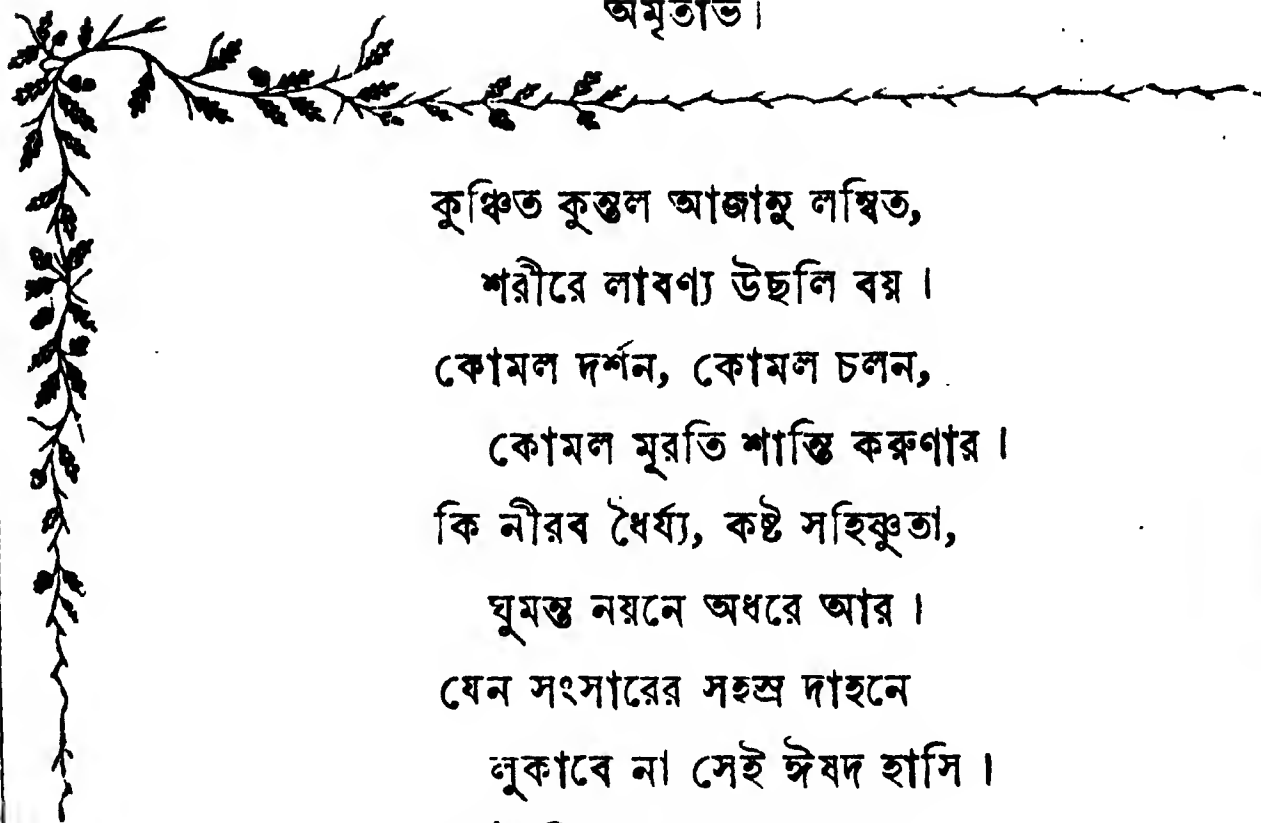




ষষ্ঠ সর্গ।

পূর্বরাগ।

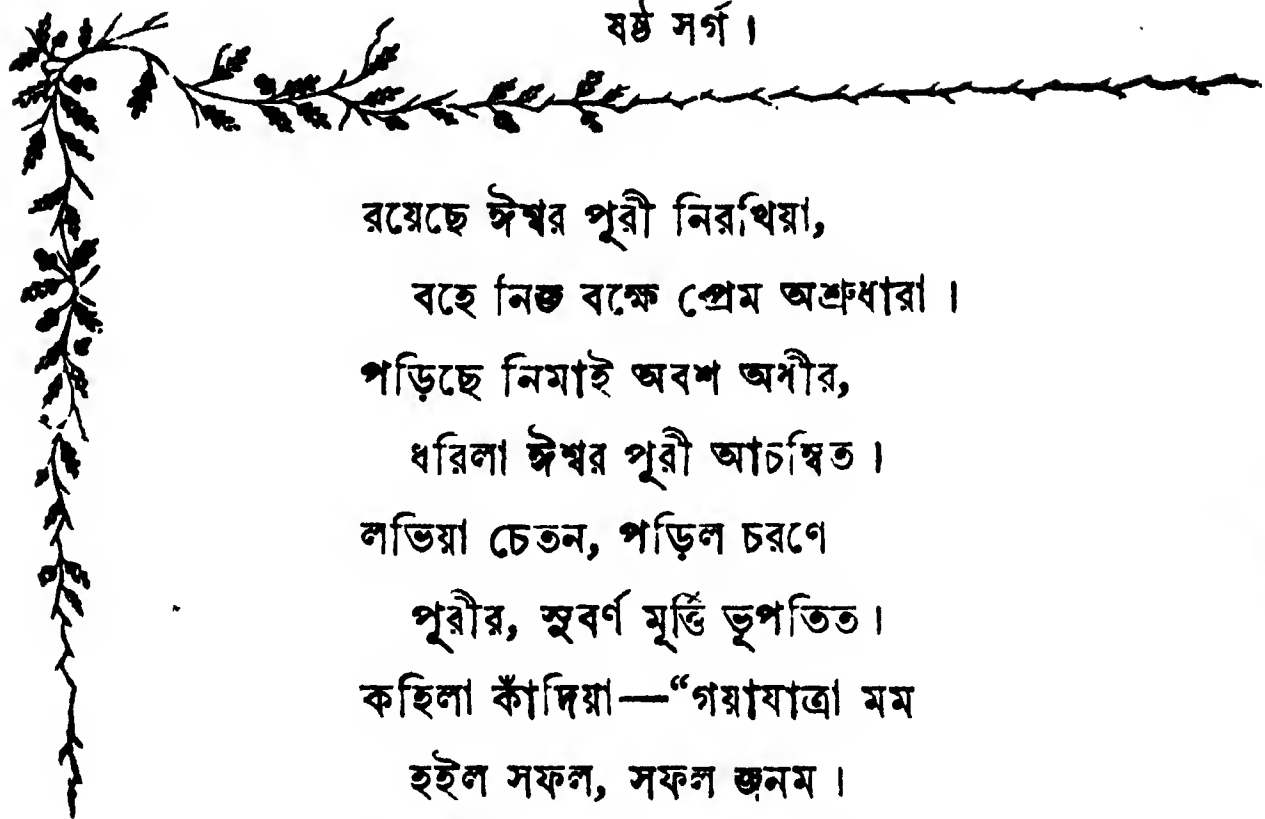
বিজলি প্রতিমা, অঙ্গ ঝলমল
বালাক কিরণে তীরে জাহুবীর,
সুন্দরী বালিকা, দুইটি নয়ন
আকর্ণ বিশ্রান্ত উজ্জল স্থির।
প্ৰীতি ছল ছল নয়নের তারা
নীলাঙ্গ যুগল সলিলে ভাসি,
সুনাশা, সুভূক, সুগোল বদন,
অধরে ঈষদ সলজ্জ হাসি।
নহে অতি স্থল, নহে দীর্ঘ অতি,
সুলালিত তনু ভঙ্গিমাগয়,



কুঞ্চিত কুন্তল আজানু লম্বিত,
 শরীরে লাষণ্য উছলি বয়।
 কোমল দর্শন, কোমল চলন,
 কোমল মুরতি শাস্তি করুণার।
 কি নীরব ধৈর্য্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা,
 ঘুমন্ত নয়নে অধরে আর।
 যেন সংসারের সহস্র দাহনে
 লুকাবে না সেই ঈষদ হাসি।
 যতই পীড়িবে পুষ্পাসব যেন
 হৃদয়ের সুখা উঠিবে ভাসি।
 দিনে তিনবার করে গজান্নান,
 ভক্তিভরা ক্ষুদ্র হৃদয় বালার,
 যখন বালিকা দেখে শচীমাকে
 ভক্তিভরে ভূমে করে নমস্কার।
 “বিষ্ণুপ্রিয়া”—আহা কি মধুর নাম,
 পিতা সনাতন রাজার পণ্ডিত,
 “বিষ্ণুপ্রিয়া”—লক্ষ্মী। আবার কি লক্ষ্মী
 বধূরূপে গৃহে হবে অধিষ্ঠিত ?—
 নাইতে নাইতে, ভাবিতেন শচী ;
 ভাবিতেন ঘাটে আনন্দ সময়ে,

বালিকার মুখ চাহিয়া চাহিয়া,
 মাতৃস্নেহ পূর্ণ উদ্বেল হৃদয়ে ।
 বাল্য বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধু রূপে
 আসিলেন গৃহে, আনন্দ অপার ।
 নির্বাপিত সেই আনন্দের দীপ
 শচীর কুটীরে জ্বলিল আবার ।
 বিবাহান্তে স্নেহে দম্পতি যুগল
 ঘাইতে 'বাসরে'—ও কি ঝগৎকার !
 খেয়েছে উছট দক্ষিণ চরণে ;
 অঙ্গুলিতে রক্ত ভাসিল বালার ।
 নিমাই সে ক্ষত চাপিলা চরণে,—
 চরণে চরণে কি প্রেম কথা !
 বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণে অমঙ্গল ছায়া
 অজ্ঞাতে ভাসিল ; পাইল ব্যথা ।
 শচীর আনন্দ ধরে না হৃদয়ে,
 হাসির তরঙ্গে ঘাইছে ভাসি ।
 হায় মা ! হায় মা ! জান নাহি তুমি
 হাসি অন্ধরালে থাকে অশ্রুপ্রাণি ।
 কই, নিমাইর সে চাকল্য নাই,
 সে আনন্দ ক্রীড়া কিছুই নাই ।

সদা অন্তমনা থাকেন নিমাই,
যেন কি ভাবেন, কি যেন চাই ।
শচীমাতা চাহে ভাবুক নিমাই
বধুর সে রূপ, চরিত্র বধুর ।
নিমাই ভাবেন পূর্ব বঙ্গ ভাব,
ঈশ্বরপুরীর ভাব সুমধুর ।
জানেন গিয়াছে গয়া তীর্থে পুরী ;
চলিলেন গয়াতীর্থে বিশ্বস্তর
পিতৃকার্য্য তরে কহিয়া মায়েরে ;
হইলেন শচী কাতর অন্তর ।
সুন্দর শরত, ভরা ভাগীরথী
তীরে তীরে পথ করি পর্য্যটন,
উপনীত গয়া তীর্থে বহু দিনে
'মন্দার', 'রাজগীর' করিয়া দর্শন ।
'বিষ্ণুপদ' চক্ষে দেখিলা নিমাই ;
দেখিলা, পলক পড়িল না আর ।
স্থির ছনয়ন, মুখে কি পুলক,
বহে নেত্রে ফলু ধারা অনিবার ।
বিস্মিত স্তম্ভিত রয়েছে চাহিয়া
দর্শক, পূজক, যুবা আত্মহারা ;



রয়েছে ঈশ্বর পুরী নিরখিয়া,
 বহে নিস্ত বক্ষে প্রেম অশ্রুধারা ।
 পড়িছে নিমাই অবশ অশীর,
 ধরিলা ঈশ্বর পুরী আচম্বিত ।
 লভিয়া চেতন, পড়িল চরণে
 পুরীর, স্তব্ধ মূর্তি ভূপতিত ।
 কহিলা কাঁদিয়া—“গয়াযাত্রা মম
 হইল সফল, সফল জনম ।
 আজি হইলাম শ্রীকৃষ্ণের দাস,
 দেখিলাম আজি কৃষ্ণের চরণ ।
 হে গৌসাই ! ভব সাগরে ডুবিয়া
 থাইতেছি হাবুডুবু নিরন্তর ।
 তুমি দয়া কর, পাদপদ্মে তব
 সঁপিলাম মম এই কলেবর ।
 তুমি কৃপা দৃষ্টি করিয়া আমারে
 দেও দীক্ষা, দেও শিক্ষা কৃষ্ণ নাম !
 যেন কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে,
 করি আমি কৃষ্ণ প্রেম সুধাপান ।”
 কহিলেন পুরী—“পণ্ডিত ! পণ্ডিত !
 যে দিন তোমারে দেখি নদিয়ায়,

সেই দিন চিত্ত জুড়াল আমার,
সেই দিন আমি চিনেছি তোমায় ।
মন্ত্র “গোপীজন-বল্লভ” মধুর
দিয়া কর্ণে, প্রেমে দিলা আলিঙ্গন ;
উভয়ের প্রেমে উভয় অধীর ;
উভয়ের নেত্রে প্রেম প্রস্রবণ ।
উভয় অবশ ; উভয়ের গলা
ধরিয়া উভয় অর্ধ মুরছিত,
প্রেম অশ্রুধারা ঝরি উভয়ের
উভয়ের দেহ করিছে প্লাবিত !
সে দিন হইতে কুলমান শীলা,
শীলা পাণ্ডিত্যের করি অস্তহিত,
ভক্তি ভাগীরথী জন্মি বিষ্ণুপদে
হইলেন হরদ্বারে উপনীত ।
সে দিন হইতে পূর্বরাগ বেগে
ছুটিল ভারত করিতে উদ্ধার ।
সে দিন হইতে ঐরাবত মত
ছুটিল ভাসিয়া নিমাই আর ।
মুখে নাহি কথা, চাহি উর্দ্ধপানে
অনিমিষ নেত্রে, বসিয়া কখন,

বিরলে আপনি কহেন কি কথা,
 কখন কি ভাবি করেন রোদন ।
 একদা জপিতে জপিতে সে মন্ত্র
 “কৃষ্ণ ! বাপ কোথা রহিলে আমার !”—
 কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে হইয়া মুচ্ছিত,
 পড়িলা ভূতলে, মূর্ত্তি করুণার ।
 চেতন পাইয়া যশোদার ভাবে
 বিভোর কাঁদিয়া কহিলা আবার—
 “কৃষ্ণ ! বাপ আমার ! পারি না যে আমি
 তোমা বিনে প্রাণ রাখিতে আর ।
 বহু কষ্টে ধৈর্য্য ছিলাম ধরিয়া
 এত দিন, আমি পারি না আর ।
 আর লুকাইয়া থাকিও না বাপ !
 দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াও আমার !”
 চাহি সঙ্গীগণে কহিলা কাতরে—
 “যাও গৃহে ; আমি যাব না আর ;
 কহিও মায়েরে কৃষ্ণ দরশনে,
 গেছে বৃন্দাবনে নিমাই তোমার ।”
 সেই গড়াগড়ি ধূলায় পড়িয়া,
 সেই কাতরতা, করুণ রোদন,

অবিশ্রান্ত দুই নয়নের ধারা,—

কাঁদিতে লাগিল দেখি সঙ্গীগণ ।

একদা একক রজনীর শেষে,

বৃন্দাবন মুখে ছুটিলা কাঁদিয়া

নাহি বাহুজ্ঞান ভাবেতে বিভোর,

সঙ্গীগণ কষ্টে রাখিল ধরিয়া ।

কষ্টে সঙ্গীগণ মিলি নদিয়ায়

আনিল, সমস্ত পথেতে অধীর ।

দেখে নবদ্বীপ, শ্রীমান, শ্রীবাস,

দেখেন মুরারি নয়ন স্থির—

একি রূপান্তর ! সে চাঞ্চল্য নাই ;

নাহি সে বিজ্রপ ; কি বিনয় মুখে !

মলিন অধরে কি ঈষদ্ হাসি !

কি যেন কি ভাব উথলিছে বুকে !

অরুণ করুণ সজল নয়ন,

যেন ভাসমান রক্ত কমল ।

ডুবাইয়া তারা চাহে নেত্র ধারা

পড়িতে, লুকায়ে মুছে অবিরল ।

মুখে নাহি কথা, সদা অন্তমনা ;

কি কহিতে চাহে, কি কথা কহে !

কি যেন কি ভাবে, কি যেন কি দেখে,
সলজ্জ আনত বদনে রয়ে ।
যেন কিশোরীর হৃদয়ে চঞ্চল
নব অনুরাগ হয়েছে সঞ্চার ;
যুমন্ত সাগর সলিলে সুনীল
ভাসিয়াছে যেন চন্দ্র দ্বিতীয়ার ।
প্রাণের উচ্ছাস চাপিয়া যতনে
করিতে গয়ার মহিমা কীর্তিত,
অত্র তীর্থ কথা কহি, “বিষ্ণুপদ”—
কহিতে, হইল। আবেগে মুচ্ছিত ।
ছুটিল নয়নে অশ্রুর প্রবাহ,
তিতিয়া বদন তিতিয়া ভুতল ।
দেখি সে করুণা, সেই কাতরত',
শ্রীমান শ্রীবাস কাঁদে ভরুদল ।

* * * *

গভীর রজনী ; বসিয়া শয্যায়
অঝোর নয়নে কাঁদেন নিমাই ।
ফুটন্ত কলিকা বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
দাঁড়ায়ে কোণায়, নেত্রে নিদ্রা নাই ।

নিরবিচ্ছে অবগুঠন হইতে
পতির কাতর করুণ রোদন ।
বহিতেছে ধারা নয়নে তাহার
মুছিছে বালিকা অঞ্চলে নয়ন ।
ও কি অশ্রুধারা !—গঙ্গা ধারা যেন
বহিছে পতির কপোল বাহি ।
এত অশ্রুজল মানব নয়নে
থাকে কি ?—ভাবিছে বালিকা চাহি ।
বসি অধোমুখে নখাগ্রে শয্যায়
আঁকেন কি যেন অশ্রুতে যতনে ।
ঈষদ হাসিয়া—রোদ্র বরিষায়—
কহেন কি কথা অশ্রুট বচনে ।
কেন এ রোদন ? করেছে কি বাল্য
কোনও অপরাধ চরণে তাঁর ?
কিছুই ত বাল্য না পায় ভাবিয়া,
আকুল হইল প্রাণ বালিকার ।
নিশ্চয় বালিকা করিয়াছে দোষ,
তাই অভিমান করেছেন স্বামী ।
বৃন্তচ্যুত পুষ্প কলিকার মত,
পড়িল চরণে ধরি পা দুখানি ।

ত্রস্তে মুছি ছবি, তুলি বালিকার
 কহে—“ক্ষমা কর ললিতে ! আমার ।
 কদম্বতলার সেই শ্রাম রূপ
 দেখিয়াছি শুধু নয়ন কোণায় ।
 শুধু তব মুখে সেই শ্রাম নাম
 শুনেছি যমুনা ঘাটে একবার ;
 কাণের ভিতর দিয়া সেই নাম
 পশিয়াছে প্রাণে স্বজনি ! আমার ।
 শুধু নামে যার, শুধু দরশনে,
 ঢালিয়াছে প্রাণে এ স্মৃধা আমার ।
 কহ সখি ! কহ, কহ দয়া করি,
 কেমনে পাইব চরণ তাঁর ?”
 এ কি কথা হয় ! এ কি কাতরতা !
 কিছুই বালিকা বুঝিতে না পারে ।
 নয়ন মুছিয়া ধীরে ধীরে গিয়া
 করিল আঘাত শচীমার দ্বারে ।
 “উঠ মা ! উঠ মা !” ডাকে বিফুপ্রিয়া,
 ব্যাকুল জননী খুলিল দ্বার ।
 চরণে পড়িয়া কহিল বালিকা—
 “যাও মা ! ও ঘরে, যাও একবার ।”

পাগলিনী মত ছুটিলেন মাতা
 পশি শয্যা গৃহে রহিলা চাহি ।
 সেই রূপ বসি কাঁদিলে নিমাই,
 কি যেন আঁকিছে—বাহুজ্ঞান নাহি ।
 মায়ে একবার, মায়ে দুই বার,
 অধীরা জননী ডাকে বহুবার ।
 বুকে নিয়ে কহে—“নিমাই ! নিমাই !
 কেন কাঁদ বাপ কি দুঃখ তোমার ?”
 লভিয়া চেতনা, সম্বরি আবেগ,
 কহিলা নিমাই,—“দেখেছি স্বপনে,
 মা গো ! কি সুন্দর নবীন কিশোর,
 গলে বন মালা, বাঁশরী বদনে ।
 কিবা নীলিমার মহিমা শ্রীঅঙ্গে,
 কি সুন্দর চূড়া চিকুরে হেলে !
 কিবা পীতাম্বর শোভিছে সুন্দর,
 নবঘনে কিবা বিজুলি খেলে !
 দেখিয়া সে রূপ এ আনন্দ ধারা
 বহিতেছে—কেন, কিছুই না জানি ।
 দেখিতে তাহাকে আকুল পরাণ ;
 কহ মা ! কেমনে দেখিব আমি ?”

কহিতে কহিতে আবেগে আবার
 পড়িলা মুচ্ছিত মায়ের বুকে ।
 আছে শচীমাতা, আছে বিষ্ণুপ্রিয়া,
 চাহি অশ্রুযুথী, কথা নাহি মুখে ।
 ভাগীরথী তীরে দীন ব্রহ্মচারী
 থাকে শুক্লাশ্রম । তথা পরদিন
 কহিতে কহিতে তীর্থের কাহিনী,
 আবার হইয়া চেতনা হীন
 পড়িতে, ধরিলা কাষ্ঠ খুটি এক ;
 ভগ্ন খুটি সহ পড়ি আজিনায়,
 সোণার পুতুলি যায় গড়াগড়ি ;
 তোলে ভক্তগণ, করে হায় ! হায় !
 কাঁদি গদাধর পড়িলা চরণে ;
 কহিলা নিমাই পাইয়া চেতন—
 “আজীবন তুমি ভজিলে শ্রীকৃষ্ণ,
 গদাধর ! তব সফল জীবন ।
 আমার জীবন হইল নিষ্ফল,
 পেয়ে কৃষ্ণ আমি হারয়েছি হায় !”
 বলিতে বলিতে হইলা অবশ
 আবার মুচ্ছিত পড়িলা ধরায় ।

হইয়া আবিষ্ট কহিলা নিমাই—

“ছাত্রগণ ! আহা কি মধুর নাম !

করুণ মঙ্গল কৃষ্ণ তোমাদের,

এ বিদ্যা শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন ?

সকল বিদ্যার সার কৃষ্ণনাম,

জীবনের লক্ষ্য তাঁহার চরণ ।

মৃত্তা বৃত্তি কৃষ্ণ, টীকা কৃষ্ণনাম,

আগম, বেদান্ত, কৃষ্ণই দর্শন ।

হর্তা কর্তা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পালয়িতা,

ছাত্রগণ ! কৃষ্ণ জগতজীবন ।

মুগ্ধ অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়

ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি দেয় শিক্ষা আর ।

করুণা সাগর, নন্দের নন্দন,

সেবক বৎসল শ্রীকৃষ্ণ আমার ।

ছাড়ি কৃষ্ণ ভক্তি, করে অধ্যাপনা

অন্য শাস্ত্র অধ্যাপক সেই জন,

শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে, শুধু শাস্ত্র

গর্দভের মত করে সে বহন ।

পড়িয়া গুনিয়া মুর্থ সেই জন,

বিদ্যা শিক্ষা তার চিনি বহা সার,

পূর্ণ যেই কৃষ্ণ মহোৎসবে ধরা,
সে উৎসবে নাহি নিমন্ত্রণ তার ।
জগতের আদি, অন্ত, মধ্য, কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ সৰ্বকাল, কৃষ্ণ সৰ্বস্থান ;
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজ শিষ্যগণ !
শিষ্যগণ সবে গাও কৃষ্ণনাম ।”

* * *

যায় এক দিন, যায় দুই দিন,
এই রূপে চলি গেল দশ দিন ।
পড়াইতে বসি শুধু কৃষ্ণ কথা,
কহিতে কহিতে চেতনা হীন ।
দশম দিবসে লভিয়া চেতন
কহিলা নিমাই কাতর স্বরে,—
“বৎসগণ ! যাও ছাড়িয়া আমারে,
যাও অন্ত টোলে অধ্যয়ণ তরে ।
পড়াইতে বসি দেখি কি সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ শিশু অধরে বাঁশি ।
শুনি বংশীধ্বনি হারাই চেতনা,
অজ্ঞাত আনন্দ সাগরে ভাসি ।”

ছিল যেই শিষ্য সম্মুখে তাঁহার,
লয়ে তারে বুকে করুণ প্রাণ
কহিলেন—“গাও ! গাও বৎস গাও,
জুড়াইয়া প্রাণ গাও কৃষ্ণনাম !”
কাঁদিছেন গুরু, কাঁদি শিষ্যগণ
পড়িল চরণে আকুল প্রাণ,
কহে—“গুরুদেব ! অধ্যয়ন শেষ,
শিখাও কেমনে গাব কৃষ্ণনাম ।”

—○—

গীত—কেদার রাগ ।

“হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় ষাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।”
হাত তালি দিয়া গাইছেন গুরু,
হাত তালি দিয়া গায় শিষ্যগণ,
জুড়াতে তাপিত, উঠিল প্রথম
নবদ্বীপে শুভ শ্রীনাম কীর্তন ।
ছোটে নবদ্বীপ, ছোটে নরনারী,
শুনি শিষ্য মুখে নবীন গান,
দেখে গুরু শিষ্য করে গলাগলি,
করে গড়াগড়ি, নাহি বাহজান ।

স্তম্ভিত দর্শক, স্তম্ভিত নগর,
 আবালক বৃদ্ধ স্তম্ভিত সকল,
 ভক্তিতে বিস্ময় মিলাইল ধীরে,
 করিল প্রণাম নয়ন সজল ।
 চারি শত বর্ষ গত,—অশ্রুজলে
 করিছে প্রণাম আজি এই দীন ।
 তব শিষ্যরূপী শিশু পুত্র তার,
 আজি নির্বাসনে পরীক্ষাধীন ।
 গুরুরূপে শিশু হৃদয়ে তাহার,
 আজি দয়াময় ! হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
 কর শেষ আজি অধ্যায়ন তার ;
 কর তব নামে, কার্যোতে দীক্ষিত ।





সপ্তম সর্গ ।

মহা প্রকাশ ।

এই রূপে বিষ্ণুপদে কৃষ্ণ প্রেম ভাগীরথী
গয়ায় জন্মিয়া সুরধনী,
ভেদি শাক্ত হিমাচল, ছয় শৃঙ্গ দর্শনের ;
প্রক্ষালিয়া পতিত পাবনী
নির্ম্মম তত্ত্বের তপ্ত জীব শোণিতের পঙ্ক ;
ভাসাইয়া শৈল অবরোধ
স্মৃতির বিদ্বেষ দৃঢ়, আচারের ভস্মরাশি,
স্বার্থ-পূর্ণ পাণ্ডিত্য নির্বোধ ;
ছুটেছিল সিদ্ধমুখে, সঙ্কীর্ণন কলকলে,
হরিনাম ঘোষি 'হরিদ্বার' ;

পুণ্ডরীক প্রেমধারা, ভোগবতী 'ভোগমতী'
বহি হৃদে পুণ্য উপহার ।
মিলিল তাহাতে ক্রমে নিত্যানন্দ প্রেমধারা,
নিরমল ধারা যমুনার ;
হরিদাস প্রেমধারা, দীনা শীর্ণা সরস্বতী ;—
করি প্রেম-দ্বিবেণী সঞ্চার ।
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ নবদ্বীপে প্রেমগঙ্গা
ছুটিলেন উচ্ছ্বাসে বত্মার,
সাগরের তীর বাসী পতিত সগর বংশ
ভস্মীভূত, করিতে উদ্ধার ।
শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উঠিল কীর্তন ধ্বনি,
উঠিল শচীর আঙ্গিনায়,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস ভরা, টলমল নবদ্বীপ,
শাস্তিপুৰ, প্রেমের বত্মায় ।
নিমায়ের দুইভাব—ভক্ত ভগবান ভাব,—
ফুটিয়া উঠিছে দিন দিন,
কভু ভগবান ভাব, ঐশ্বর্য্য পূর্ণিত দেহ,
ভক্ত ভাব কভু দীনহীন ।
যারে চাহে ভাবাবেশে দেয় প্রেমে গড়াগড়ি,
যারে করে কর পরশন

মূৰ্চ্ছিত তাড়িতাহত পড়ে পদান্বজে প্রেমে,

নাচে করি অশ্রু বরিষণ ।

কাঁদি কহে গদাধর—“সকলে পাইল প্রেম,

প্রভু ! আমি অতি নরাধম ;

কর দয়া !” প্রভু কহে—“তুমি কাল পাবে প্রেম,

গঙ্গাস্নান করিবে যখন ।”

পরদিন গঙ্গাস্নান করি নাচে গদাধর,

“পাইলাম, পাইলাম”—বলি ।

সবিস্ময় নরনারী দেখে—কাঁদি গদাধর

নেচে নেচে যাইতেছে চলি ।

একদা আচার্য্য কহে—“দেখিলেন নিত্যানন্দ !

দেখাও শ্রীকৃষ্ণ একবার !”

কহিল হাসিয়া প্রভু—“কেমনে দেখাব আমি ?

দেখ কৃষ্ণ হৃদয়ে তোমার ।”

আচার্য্য মুদিয়া নেত্র আনন্দে বসিলা ধ্যানে,

রহিলেন ধ্যানে কিছুক্ষণ ।

বহিরা কপোল তাঁর বহিতেছে প্রেমধারা,

পুলকিত কি প্রেমে বদন !

আচার্য্য নয়ন মেলি রহিলেন চাহি স্থির

নিমায়ের পানে অপলক ।

জিজ্ঞাসে শ্রীবাস তাঁরে—“কহ কি দেখিলে প্রভু !

কেন এই আনন্দ পুলক ?”

কহিলা আচার্য্য স্থির—“কি আর দেখিব বল ?

দেখিলাম, মুদিলে নয়ন,

ইনি কৃষ্ণরূপে মম পশিলেন হৃদয়েতে,

পূর্ণচন্দ্র সলিলে যেমন ।”

হাসিয়া কহেন প্রভু—“নয়ন মুদিয়া তুমি

নিদ্রায় কি দেখিলে স্বপন ;

হইলাম আমি দোষী ? এমন অশ্রায় কথা

বল পুনঃ ত্যজিব জীবন ।”

কহিলা অদ্বৈত হাসি—“কেন আর প্রবঞ্চনা

কর প্রভু ! আমাদের সনে ।

শ্রীবাস অদ্বৈতে বলকতই বঞ্চিবে আর ?

দেও প্রেম আমরা দুজনে ।”

ভক্তভাবে আশ্রহারা ছুটিলেন বিশ্বস্তর ।

কাঁপ দিয়া পড়িলা গঙ্গায় ।

পশ্চাতে ছুটিয়া বেগে নিত্যানন্দ হরিদাস,

পড়িলেন কাঁদি উভরায় ।

নিত্যানন্দ ধরি কেশ, হরিদাস হুচরণ,

তুলিলেন স্বর্ণ মূর্তি তীরে,

বিশ্বস্তর অচেতন ; ভক্তগণ মর্শাহত ;

সেবিতেছে ভাসি অশ্রুণীরে ।

জাগিয়া কহেন প্রভু—“আমায় তুলিলে কেন ?

আমার যে মরণ মঙ্গল ।”

“কেন চাহ মরিবারে ?”—নিত্যানন্দ কহে ক্রোধে,

“মর তুমি, মরিব সকল ।”

কহেন কাতরে প্রভু—“কোথা পাব প্রেম আমি ?

প্রেমহীন কঠিন পাষণ ।

রাখিব জীবন যদি শ্রীপাদ তোমরা বল

আমাকে করিবে প্রেম দান ।

সকলে প্রতিজ্ঞা কর, আমি কৃষ্ণ—হেন কথা

আনিবেনা মুখে কদাচন ।”

অশ্রুতে সৈকত বালি সিক্ত করি, সকলের

পদধূলি করিলা গ্রহণ ।

ক্রমে ভগবান ভাব বাড়িতেছে দিন দিন,

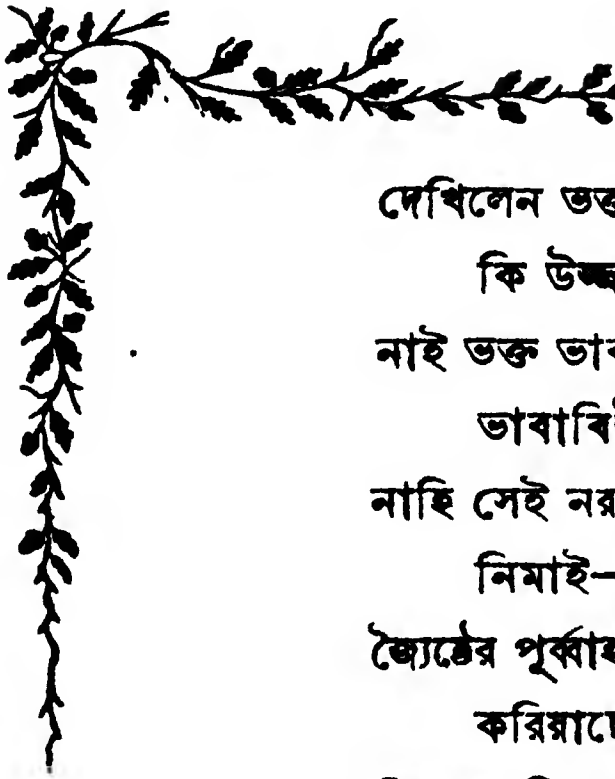
ভাবাবিষ্ট প্রহর প্রহর

থাকেন নিমাই কভু, রহিলা প্রহর সপ্ত

একদিন শ্রীবাসের ঘর ।

সঙ্কীর্ণনে ভাবাবেশে বসিয়া বিকুর খাটে

কহিলেন—“কর অভিষেক !”



দেখিলেন ভক্তগণ, ঝলসিছে গৌরদেহে

কি উজ্জ্বল দিব্যালোক এক ।

নাই ভক্ত ভাব আর, ঐশ্বরিক মহাভাবে

ভাবাবিষ্ট যোগস্থ নিমাই ;

নাহি সেই নর দেহ, নাহি সেই নর ভাব,

নিমাই—নিমাই আর নাই ।

জ্যোতের পূর্কাহ প্রভা পরাভবি কিবা জ্যোতি

করিয়াছে গৃহ আলোকিত !

কি জ্যোতি নরনে ভাসে ! কি জ্যোতি বদনে হাসে !

কিবা জ্যোতি অঙ্গে তরঙ্গিত !

ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ আনি সুরধনি বারি,

পড়ি মন্ত্র করিলা সেচন,

মুকুন্দ আনন্দে গায় অভিষেক সুরধন,

হলুধনি করে নারীগণ ।

পরায় কোষিক বাস, কোষিকের পীতধড়া,

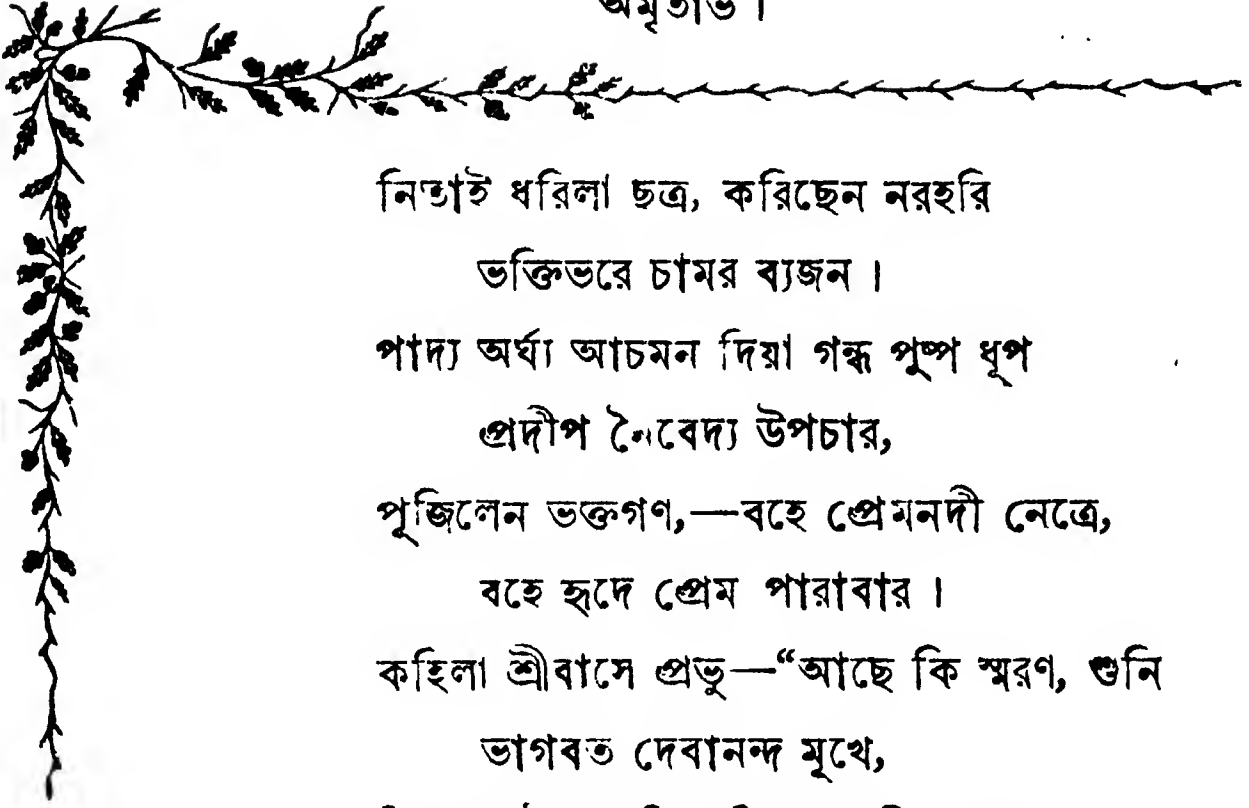
শিরে পুষ্পমালা মনোহর ;

টান্চর বেনীতে শোভে পুষ্পে চুড়া মনোহর ;

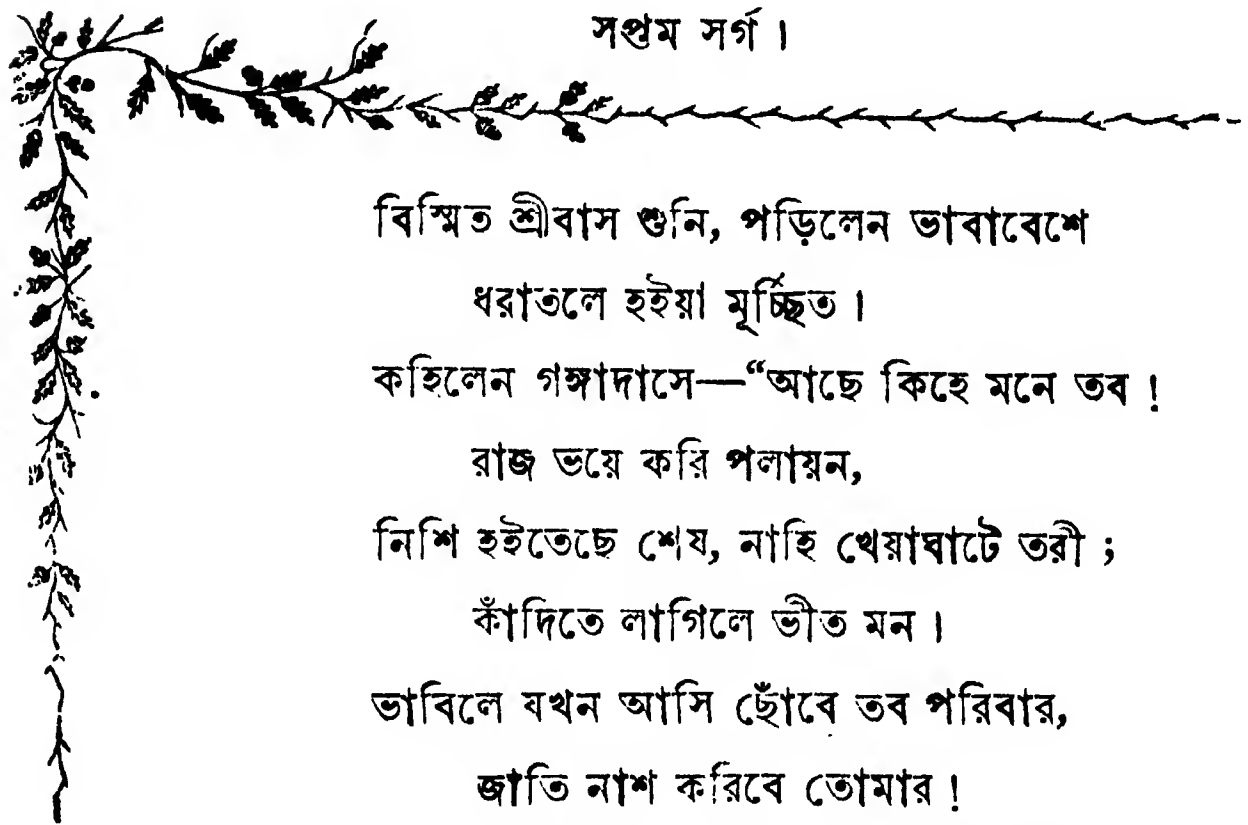
কর্ণে পুষ্প কুণ্ডল স্বন্দর ।

অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পহার, ললাটে চন্দন চিত্র,

মুখ অঙ্গে চিত্রিত চন্দন ।



নিভাই ধরিলা ছত্র, করিছেন নরহরি
ভক্তিভরে চামর ব্যজন ।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপ
প্রদীপ নৈবেদ্য উপচার,
পূজিলেন ভক্তগণ,—বহে প্রেমনদী নেত্রে,
বহে হৃদে প্রেম পারাবার ।
কহিলা শ্রীবাসে প্রভু—“আছে কি স্মরণ, গুনি
ভাগবত দেবানন্দ মুখে,
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলে ধরণী তলে,
অশ্রুধারা ঝরিতেছে বুকে ।
হাসিল পড়ুয়াগণ তোমাকে টানিয়া ল’য়ে
কৌতুকে মিলিয়া ছাত্রগণ,
ফেলিল বাহির দ্বারে ; হাসিলেন দেবানন্দ ;
গুরু যথা শিষ্যও তেমন ।
পাইয়া পরম দুঃখ, আসিয়া আলয়ে তব,
মন দুঃখে বসিয়া বিরলে,
আরবার ভাগবত আপনি পড়িলে তুমি,
ধরাতল তিতি অশ্রুজলে ।
হৃদয়ে বসিয়া তব, দিলাম সাক্ষনা আমি,
প্রেমানন্দে করি উচ্ছ্বসিত ।”



বিস্মিত শ্রীবাস শুনি, পড়িলেন ভাবাবেশে
 ধরাতলে হইয়া মূর্ছিত ।
 কহিলেন গঙ্গাদাসে—“আছে কিহে মনে তব !
 রাজ ভয়ে করি পলায়ন,
 নিশি হইতেছে শেষ, নাহি খেরাঘাটে তরী ;
 কাঁদিতে লাগিলে ভীত মন ।
 ভাবিলে যখন আসি ছোঁবে তব পরিবার,
 জাতি নাশ করিবে তোমার !
 সঙ্কল্প করিলে মনে, প্রভাতে জাহ্নবী গর্ভে
 প্রবেশিবে সহ পরিবার ।
 বিপদ ভঞ্জন হরি ! রক্ষা কর এ বিপদে !—
 ডাকিলে আমায় বার বার ।
 আসিল তরণী মাঝি, কাঁদিয়া কহিলে ডাকি—
 রক্ষা কর জাতি মানধন !
 করিলাম গঙ্গাপার । আছে কিহে মনে তব ?”
 গঙ্গাদাস মূর্ছিত তখন ।
 এইরূপে ভক্তগণে অতীত জীবন কথা—
 কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া,
 দিবস হইল শেষ আসিল নিদ্রাঘ সন্ধ্যা,
 শঙ্খ ঘণ্টা উঠিল বাজিয়া

মন্দিরা মৃদঙ্গ সহ ; জ্বলাইয়া ধূপ দীপ,
করিল আরতি ভক্তগন ।
বামাগণ ছনুধ্বনি করিতেছে ঘন ঘন,
করি পূর্ণ সায়াহ্ন গগন ।
প্রেমে আত্মহারা সবে, সবার বিশ্বাস দৃঢ়,
সম্মুখে বসিয়া ভগবান ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়াগড়ি যায়,
কেহ পড়ি নাহি বাহুজ্ঞান ।

হাসিয়া কহিল প্রভু—“পটুয়া শ্রীধরে আন,
বড় দুঃখে ডাকে সে আমার ।”
দেখে গিয়া ভক্তগণ, শ্রীধর জাগিছে নিশি,
“কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” ডাকি উভরায় ।
আসিলে শ্রীধর, প্রভু কহিলা ঈষদ হাসি,—
“বড় দুঃখ পেয়েছ শ্রীধর !
তোমার খোলার অন্ন, তোমার হস্তের দ্রব্য,
খাইয়াছি আমি নিরন্তর ।
কতই তোমার সঙ্গে করিয়াছি কাড়াকাড়ি,
করিয়াছি কতই কোন্দল ।

শ্রীধর ! আমার রূপ কর আজি দরশন !”

প্রেমানন্দে শ্রীধর বিহ্বল

চাহি মাথা তুলি দেখে, নাহি আর বিশ্বস্তর,

শ্রামল তমাল মনোহর

তমাল তলায় কৃষ্ণ, করেছে মোহন বাঁশি,

শিখি পুচ্ছ চূড়া কি সুন্দর !

বাজে কি মধুর বাঁশি । পড়িল বিহ্বল প্রেমে

পদতলে শ্রীধর মূর্ছিত ।

প্রভু কহে—“উঠ ! উঠ !” শ্রীধর পাইল জ্ঞান,

প্রভু কহে—“গাও স্তুতি গীত ।”

শ্রীধর কাদিয়া কহে—“মূর্থ খোলাবেচা আমি ;

কিবা স্তুতি করিব তোমায় ?”

প্রভু কহে—“কর স্তুতি, করিবেন সরস্বতী

শ্রীধরের জিহ্বাগ্রে বিহার ।”

বহিল শ্রীধর কণ্ঠে কিবা উচ্চ স্তুতি ধারা,

গোমুখীর ধারা অবিরল ;

হইল বিস্মিত সব, স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য

হইলেন বিস্ময় বিহ্বল ।

আনন্দে কহিলা প্রভু—“শ্রীধর কি চাহ বর ?

দিব আজি অষ্ট সিদ্ধি বর ।”

কহিলা শ্রীধর—“প্রভু ! আর ভাঁড়াইতে তুমি
পারিবে না দরিদ্র শ্রীধর ।”

প্রভু কহে পুনঃ পুনঃ—“চাহ বর চাহ বর !

শ্রীধর কহিল—“দেও বর ! .

যে ব্রাহ্মণ নিল কাড়ি আমার খোলার অন্ন,
করিল কোন্দল নিরন্তর,

জন্মে জন্মে সে ব্রাহ্মণ হবে মম প্রাণনাথ ;

জন্মে জন্মে পাদপদ্ম তার,

হবে শ্রীধরের প্রভু ।” শ্রীধরের বক্ষ বাহি

বহিতেছে ধারা বরিষার ।

হাসিয়া কহিলা প্রভু—“শ্রীধর সাম্রাজ্য এক,

করিব তোমায় আমি দান ।”

শ্রীধর কাঁদিয়া কহে—“নাহি চাহি রাজ্যধন,

দেও বর গাব তব নাম ।”

মুরারিকে ডাকি প্রভু কহে—“দেখ রূপ মম !”

তাহার উপাশ্র রঘুনাথ,

মুরারি বিশ্বয়ে দেখে নবদুর্কাদল শ্রাম

রামমূর্তি ধনুর্কাণ হাত ।

মুরারি মূর্ছিত পড়ি কাঁদিতেছে ধরাতলে,

প্রেমে গুঞ্চ কাষ্ঠ করি দ্রব ।

কহিলা করুণ প্রভু—“মুরারি ! মুরারি ! উঠ,

চাহ বর অভিমত তব ।”

মুরারি কাঁদিয়া কহে—“নাহি চাহি অন্ম বর

কর প্রভু ! এই বর দান !

জন্মে জন্মে মুরারির তুমি প্রভু, আমি দাস,

গাই যেন তবগুণ গান ।

যেখানে যেভাবে জন্ম হউক আমার, প্রভু !

তব স্মৃতি থাকে যেন মনে,

জন্মে জন্মে তব দাস, হইবে বাহারি যথা,

থাকি যেন তাহাদের সনে ।

‘তুমি প্রভু, আমি দাস’—ইহা না হইবে যথা,

এই সত্য কর প্রভু ! আর,

না ফেলিবে সেইখানে তব দাস মুরারিকে,

তথা জন্ম হইবে না তার ।”

মুরারি শ্রীধর কাঁদে পড়িয়া চরণ তলে,

প্রভু কহে—“এস হরিদাস ।

এস বক্ষে ! এই দেহ হতে প্রিয় তব দেহ,
এস ! পূর্ণ কর অভিলাষ !
পাইয়াছ বড় দুঃখ, পাপিষ্ঠ যবনগণ
বেত্রাঘাত করিল যখন,
আবরিয়া ভক্ত দেহ রহিলাম, বেত্র লেখা
এই অঙ্গে কর দরশন !”
দেখিলেন হরিদাস শ্রীঅঙ্গ বিক্ষত ক্ষত,
ঝরিতেছে রক্ত দর দর ।
কাঁদি উচ্ছে হরিদাস পড়িলা ধরণী তলে,
শ্বাস শূন্য স্থল কলেবর ।
প্রভু কহে—“উঠ ! উঠ ! দেখ তব প্রিয় রূপ !”
হরিদাস পাইয়া চেতন,
দেখিলা বিষয়ে চাহি—নীল মণিময় কাস্তি
কিবা রূপ মদনমোহন !
মহাবেশে হরিদাস, না পারে থাকিতে স্থির,
কহে কাঁদি—“বাপ বিশ্বস্তর !
তুমি জগতের নাথ, কর কৃপা পাতকীরে,
মহাপাপী এ তব কিঙ্কর ।
নিষ্ঠুৰ যবন আমি সৰ্বজাতি বহিষ্কৃত,
আমি সৰ্বজনের ঘৃণিত,

আমাকে দেখিলে পাপ, পরশিলে গঙ্গান্নান,
কি বুঝিব তোমার চরিত ?
এক সত্য করিয়াছি, যেই জন প্রভু ! তব
পাদ পদ্ম করিবে স্মরণ,
কীট তুল্য হয় যদি, না ছাড়িব আমি তারে,
আমি তার পূজিব চরণ ।

ছুঁ ইব চরণ তব, নাহি সে তপস্শ্রা মম,
দেখিতেও নাহি অধিকার,
বড়ই পতিত আমি, পতিত পাবন তুমি,
এক ভিক্ষা চরণে তোমার ।”

প্রভু কহে—“হরিদাস ! নিশ্চয় জানিও তব
যেই জাতি, সে জাতি আমার ।
তোমার আমার দেহ উভয় অভিন্ন এক ;
এক জল বিভিন্ন আকার ।

যা’ কিছু আমার আছে, সকলি ভক্তের মম,
হরিদাস ! সকলি তোমার ।

বল বৎস ! বল তুমি, কি চাহ, তোমার কাছে
নাহি কিছু অদেয় আমার ।”

কি দেখিবে হরিদাস, নেত্রধারা অবিরল
বহিতেছে, দেখিবে কেমনে ?

কি চাহিবে হরিদাস, প্রেম বাপ্পে রুদ্ধ কণ্ঠ !

হরিদাস পড়িল চরণে ।

অতি কষ্টে হরিদাস কহে—“বড় ক্ষুদ্র আমি,

কিন্তু প্রভু ! বড় আশা মম ।

তব ভক্ত যেইজন তাহার পাত্রে শেখ

হয় যেন মম আকিঞ্চন ।

চাহিব তোমার পদ নাহি সে যোগ্যতা মম,

মহা অপরাধ ভাবি মনে,

হে প্রভু ! হে নাথ মম ! বাপ মম বিশ্বস্তর,

এই ভিক্ষা চাহি শ্রীচরণে—

এই কৃপা কর বাপ ! মহাপাপী হরিদাস,

জন্মে জন্মে জন্ম জন্মান্তরে,

পতিত পাবন বাপ ! রাখিবে তাহারে তুমি

কুকুর করিয়া ভক্ত ঘরে ।”

প্রেমাক্রান্তে দরদর ভাসিছে নীলাঙ্গ নেত্র,

কহে প্রভু—“শুন হরিদাস !

দিবসের মুহূর্তেক, যেই মহা ভাগ্যবান

করিবে তোমার সঙ্গে বাস,

যেই ভাগ্যবান সঙ্গে তিলান্ধক কবে কথা,

নিশ্চয় সে পাইবে আমার,

তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা, সে শ্রদ্ধা আমার করে
আমি তার, যে পাবে তোমায় ।”

তখন অবৈতে চাহি কহিলা হানিয়া প্রভু—

“হে আচার্য্য ! তোমার সমান

কে আছে জগতে ভক্ত ? পড় তুমি গীতা নিত্য,

কর ব্যাখ্যা ভক্তি মুগ্ধ প্রাণ ।

যদি কোনো শ্লোকে তুমি নাহি পাও ভক্তিতত্ত্ব ;

শোকে তুমি কর উপবাস ।

পাই বড় ছঃখ আমি, বুঝাই সে ভক্তিতত্ত্ব,

তব চিত্তে হইয়া প্রকাশ ।”

কত স্বপ্ন গুপ্ত কথা একপে কহিয়া প্রভু,

কহিলা—“আচার্য্য লও বর ।”

আচার্য্য মূর্ছিত হ’য়ে পড়িলেন ধরাতলে,

“উঠ ! উঠ !” কহে বিশ্বম্ভর ।

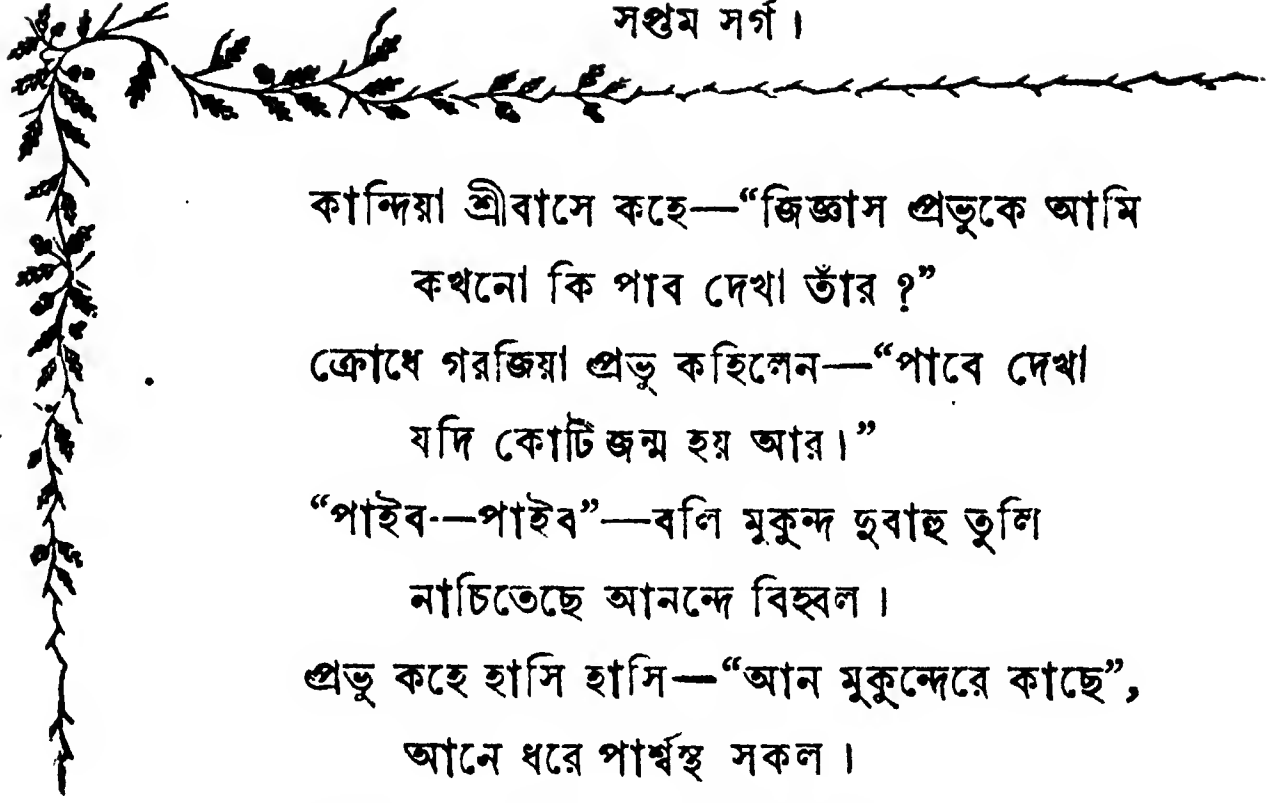
আচার্য্য উঠিয়া কহে, অশ্রুধারা ছনয়নে, —

“কি বর চাহিব আমি আর ?

মূর্থ নীচ দরিদ্রেরে কর কৃপা কৃপাময় !

কর প্রেমে পতিত উদ্ধার !”

মুকুন্দ বাহিরে বসি কাঁদিতেছে অবিরল,
কহিলেন শ্রীবাস কাতরে—
“সকলে পাইল কৃপা, মুকুন্দ তোমার প্রিয়,
কাঁদিতেছে তব কৃপা তরে ।”
প্রভু, কহে—“হেন কথা আনিও না মুখে কেহ,
কেহ নাহি কহিও আমারে ।
চেন নাই মুকুন্দে, ক্ষণে দস্তে তৃণ লয়,
চাটগেঁয়ে ক্ষণে লাঠি মারে ।
যখন যেখানে যায়, কহে সেই মত কথা,
সেই রূপে তথা মিশে যায় ।
গেলে অদ্বৈতের কাছে, ভক্তিতে বাশিষ্ঠ পড়ে
তৃণ দস্তে করি নাচে গায় ।
গেলে অল্প সম্প্রদায় নাহি মানে ভক্তিয়োগ,
লাঠি মারে আমার মাথায় ;
এমন কপটাচারী, এই তৃণ-লাঠিয়াল
না পাইবে দেখিতে আমায় ।”
মুকুন্দ ভাবিল মনে প্রভু জানিয়াছে সব,
গুরু অপরাধী আমি হায় !
না পারি করিতে আমি ভক্তিয়োগে চিন্ত স্থির,
এই দেহ ত্যজিব গঙ্গায় ।



কান্দিয়া শ্রীবাসে কহে—“জিজ্ঞাস প্রভুকে আমি
কখনো কি পাব দেখা তাঁর ?”

ক্রোধে গরজিয়া প্রভু কহিলেন—“পাবে দেখা
যদি কোটি জন্ম হয় আর ।”

“পাইব—পাইব”—বলি মুকুন্দ হুবাহ তুলি
নাচিতেছে আনন্দে বিহ্বল ।

প্রভু কহে হাসি হাসি—“আন মুকুন্দের কাছে”,
আনে ধরে পার্শ্বস্থ সকল ।

মুকুন্দ বিষয়ে দেখি বিরাট পুরুষ রূপ,
পড়িল চরণে জ্যোতির্ময় ।

হাসি হাসি কহে প্রভু—“মুকুন্দ তোমার কাছে
হইলাম আমি পরাজয় ।

অতুল বিশ্বাসে তব, অসীম ভক্তিতে আর,

আজি তুমি কিনিলে আমায় ;

করিয়াছি পরিহাস, তুমি প্রিয়তম মম

বাস মম তোমারি জিহ্বায় ।

আমার গায়ক তুমি ; আমার করের বাঁশি ;

তব কণ্ঠ বর্ষে নিরন্তর,

প্রেম ভক্তি সুধা ধারা, গোমুখীর ধারা মত,

দ্রব করি পাষণ অন্তর ।

যেইখানে গাও তুমি, অবতীর্ণ হই আমি
সেই খানে কঠেতে তোমার ;
সঙ্গীতের আকর্ষণে হয় যথা অলঙ্কিত
হৃদয়েতে ভাবের সঞ্চার ।
যখন যখন হবে পাপপূর্ণ ধরাতলে
যুগে যুগে মম অবতার,
তখন তখন তুমি মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ
হবে তুমি গায়ক আমার ।”

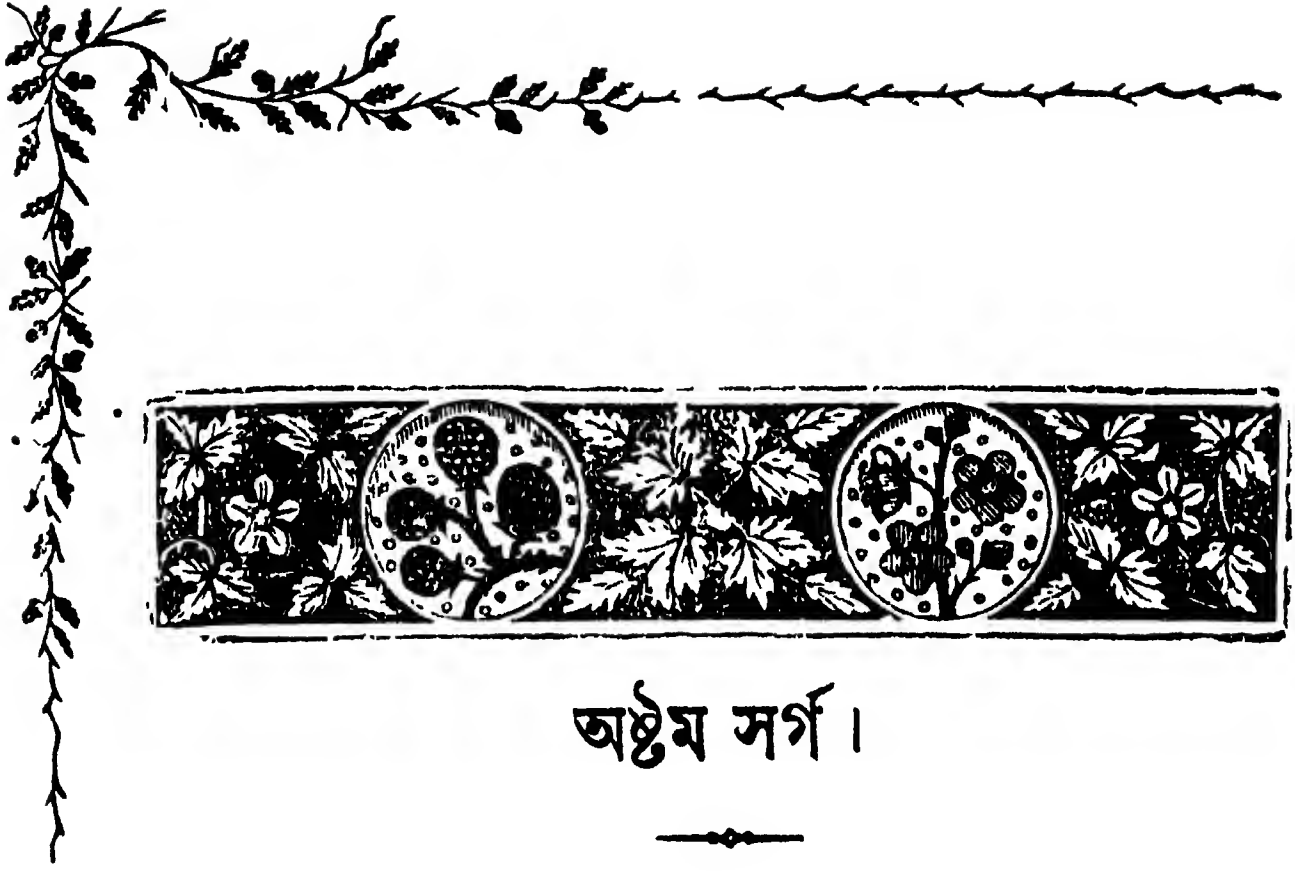
মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ ! তোমার স্বদেশী আমি,
দিয়া সুখা কণ্ঠের তোমার,
এই শুষ্ক কবিতায়, কৃপা করি দেও তুমি
প্রভুর চরণে উপহার ।
জীবন সন্ধ্যার শেষে দূর ঐরাবতী তীরে,
কঠিন সংসার মরুময়,
কঠিন শিলার সম পরিবৃত পরিবারে
নিরমম কঠিন হৃদয়,
হিংসা কৃতঘ্নতা বাণে হৃদয় বিক্ষত ক্ষত,
হৃদ রক্ত বহিছে ধারায় ;

মন্দির ও তালপূর্ণ ব্রহ্ম দেশে বসি স্বর্গ
 'অমিতাভ' মন্দির ছায়ায়,
 নিশ্চল পুত্রের মুখ লইয়া আনন্দে বৃকে,
 'অমৃতভ' পবিত্র প্রকাশ
 দেখিতেছি, শুনিতেছি মুকুন্দ ! তোমার কণ্ঠে,
 মুকুন্দের বাশরি উচ্ছ্বাস ।
 মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ ! তোমার স্বদেশী আমি,
 দিয়া সুধা কণ্ঠের তোমার
 এই শুষ্ক কবিতায়, কৃপা করি দেও তুমি
 প্রভুর চরণে উপহার !
 এই রূপে যে মন্ত্ৰের উপাসক যেই জন,
 . সেই দেখে উপাস্ত তাহার ;
 পড়িয়া চরণ তলে মাগে অনুরূপ বর,—
 ছনয়নে ধারা বরিষার ।

পোহাল সুখের নিশি, মুর্চ্ছিত হইয়া প্রভু
 পড়িলা ধরায় অচেতন ।
 রহিলেন বহুক্ষণ, নাহি জীবনের চিহ্ন ;
 চিন্তিত হইল ভক্তগণ ।

করিলে কীৰ্ত্তন সবে, নিমাই মেলিলা আঁখি,
উঠিলেন যেন স্বপ্নোখিত ;
কহিলেন—“কোথা আমি ? তোমরা এখানে কেন ?
কি দেখিছ হইয়া বিস্মিত ।
আমি কি চাপল্য কিছু করিয়াছি, ক্ষমা কর !
কিছু নাহি স্মরণ আমার ।
আমার শরীর নহে আমার আয়ত্ত আর !”
দেখে সবে,—মূৰ্ত্তি দীনতার !

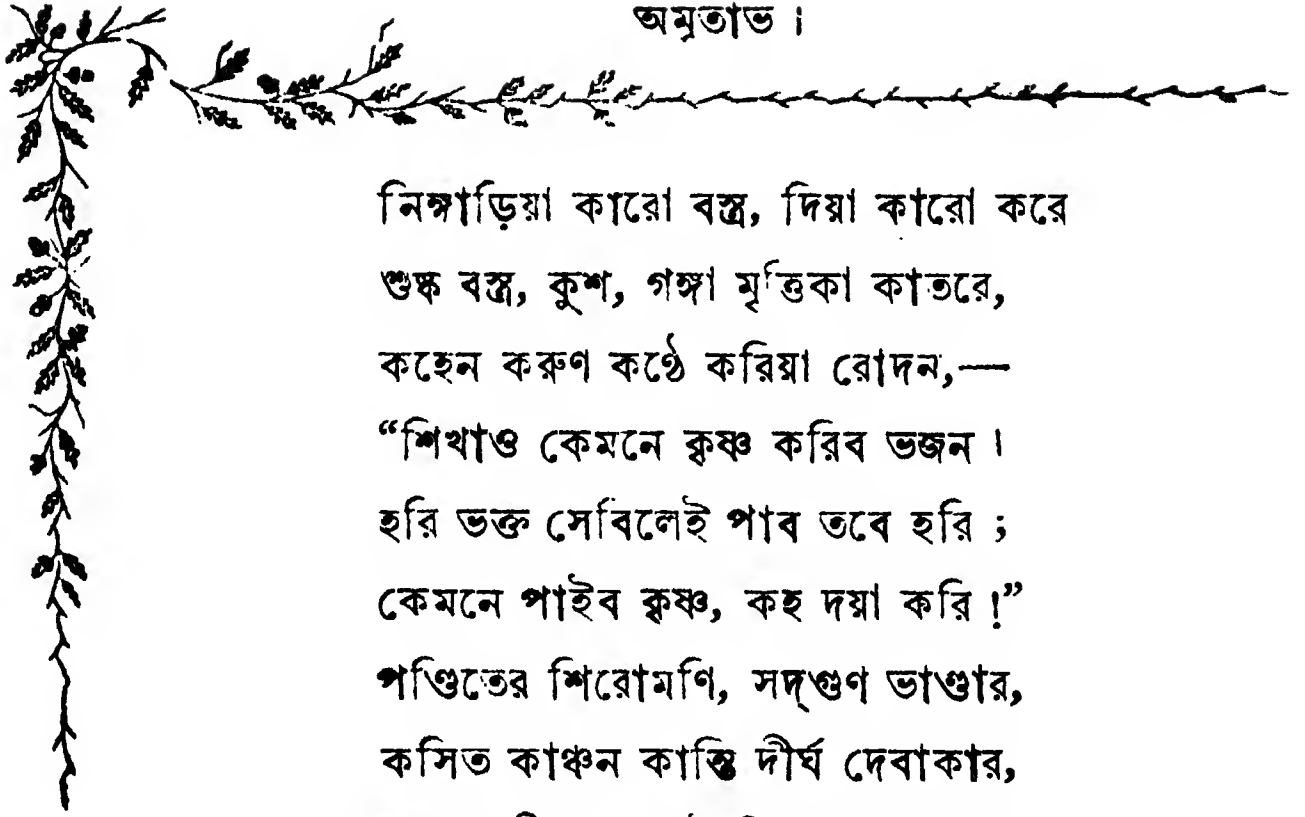




অষ্টম সর্গ ।

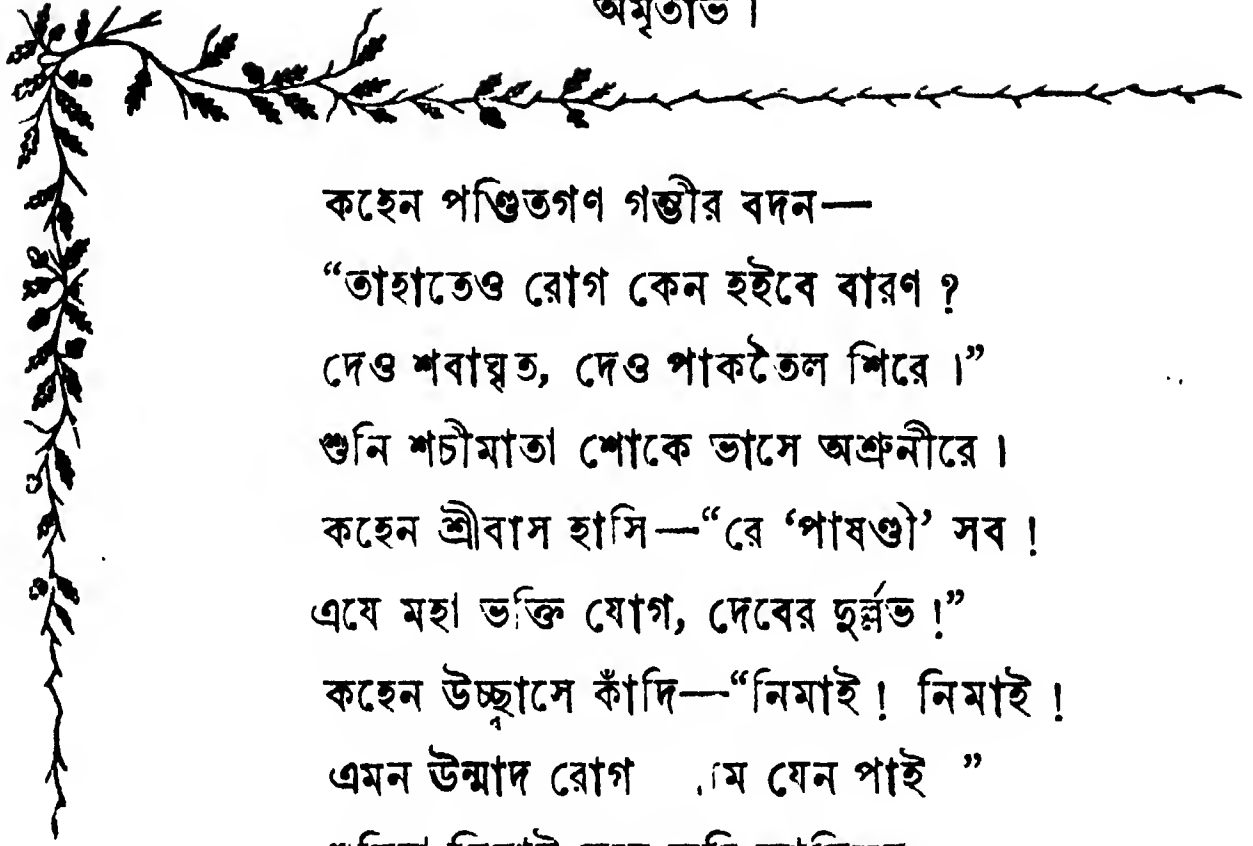
ভাবাবেশ ।

ত্রয়বিংশ বৎসর বয়স এখন,
কি লাবণ্য গৌর অঙ্গে, প্রথম যৌবন ।
হইয়াছে আকর্ষণ বিস্তৃত হৃদয়ন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবে অরুণ বরণ ।
অবিরত হৃদয়নে বহে বারি ধারা ।
আবেশে অবশ কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা ।
কৃষ্ণ নাম বিনা মুখে কিছু নাহি আর ;
দীনতার প্রতিমূর্তি, মূর্তি করুণার ।
প্রাতে গিয়া গঙ্গাঘাটে করি গঙ্গা স্নান,
জনে জনে পায়ে পড়ি করিয়া প্রণাম,



নিঙ্গাড়িয়া কারো বস্ত্র, দিয়া কারো করে
 শুষ্ক বস্ত্র, কুশ, গঙ্গা মৃত্তিকা কাতরে,
 কহেন করুণ কণ্ঠে করিয়া রোদন,—
 “শিখাও কেমনে কৃষ্ণ করিব ভজন ।
 হরি ভক্ত সেবিলেই পাব তবে হরি ;
 কেমনে পাইব কৃষ্ণ, কহ দয়া করি !”
 পণ্ডিতের শিরোমণি, সদৃশুণ ভাণ্ডার,
 কসিত কাঞ্চন কাস্তি দীর্ঘ দেবাকার,
 তাঁহার দীনতা, এই ভিক্ষা করুণার !—
 পাষণ বিদীর্ণ হয়, মানুষ কি আর ?
 দেখিলে আপন জন ধরিয়া গলায়
 কহেন কাঁদিয়া—“কহ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?
 আমি কি তাঁহার দেখা পাইব না আর ?
 হায় । অকরুণ এত কৃষ্ণ কি আমার ?”
 ব্যাকুলা জননী কহে—“নিমাই ! নিমাই !
 কেন কাঁদ, কহ বাছা ! বড় ব্যথা পাই ।
 কি পীড়া তোমার ?” পুত্র রহে নিরুত্তর ।
 আবার আবার মাতা জিজ্ঞাসে কাতর ।
 “নাহি জানি মাগো !” কহে “কি পীড়া আমার,
 কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা হয় অনিবার ।”

নিমাই প্রভাতে উঠি করিয়া রোদন
 উচৈঃস্বরে সারা দিন অশ্রু বরিষণ ।
 ব্যাকুল হইয়া কহে আসিলে শর্ষরী,—
 “কৃষ্ণ না আইল, পোহাইল বিভাবরী !”
 কাদিতে কাদিতে নিশি হইলে প্রভাত
 কহে—“এলো সন্ধ্যা, নাহি এলো প্রাণনাথ ।”
 নব অনুরাগে ব্রজকিশোরীর মত
 অঝোরে আনন্দ অশ্রু ঝরে অবিরত ।
 দেখিছেন কৃষ্ণময় সকল সংসার,
 কৃষ্ণ কথা বিনা মুখে কথা নাহি আর ।
 “কোথা কৃষ্ণ ?”—একদিন জিজ্ঞাসে কান্তর,
 “কৃষ্ণ তব হৃদয়েতে”—কহে গদাধর ।
 নিমাই নখেতে বুক করিতে বিদার,
 ধরিলেন গদাধর, করিয়া চীৎকার ;
 কাদিয়া উঠিল শচী ; নিমাই মুচ্ছিত,
 ধারায় হৃদয় বাহি বহিছে শোণিত ।
 “কি হইল ?” কহে শচী ; কহে প্রতিবাসী—
 “ভীষণ উন্মাদ রোগ !” মৃদু মৃদু হাসি,
 “বাধি হস্ত পদ, দাও স্নিগ্ধ ডাব জল,
 যাবত উন্মাদ রোগ না হয় প্রবল ।”



কহেন পণ্ডিতগণ গম্ভীর বদন—

“তাহাতেও রোগ কেন হইবে বারণ ?

দেও শবাস্থত, দেও পাকতৈল শিরে ।”

শুনি শচীমাতা শোকে ভাসে অশ্রুণীরে ।

কহেন শ্রীবাস হাসি—“রে ‘পাষণ্ড’ সব !

এষে মহা ভক্তি যোগ, দেবের দুর্লভ !”

কহেন উচ্ছ্বাসে কাঁদি—“নিমাই ! নিমাই !

এমন উন্মাদ রোগ আমি যেন পাই ”

শুনিয়া নিমাই কহে করি আলিঙ্গন —

“পণ্ডিত ! কৃতার্থ মম হইল জীবন ।

তুমিও উন্মাদ রোগ কহিলে, নিশ্চয়

পশিতাম আমি আজি জাহ্নবী হৃদয় ।”

অষ্টম, সপ্ততি বর্ষ, বৃদ্ধ সুপণ্ডিত,

শাস্তিপু্রে গঙ্গাতীরে ভক্তি বিচলিত

হৃদয়ে, পূজাস্থে বসি গৃহে আপনার,

কহিছেন—“হায় কৃষ্ণ ! প্রেমপারাবার,

পাপে পূর্ণ ধরা, কবে আসিবে আবার ?”

একি রূপ ! ফিরাইয়া সজল নয়ন,

আগ্নিনায় দাঁড়াইয়া ওকে ছুইজন ?
 নিমাই ও গদাধর ;—মিলিল নয়ন,
 সিন্ধু যেন সুধাকর করিল দর্শন ।
 সেই বৃদ্ধ ঋষি রূপ প্রেমে ঢল ঢল,
 দেখি প্রেম পারাবার হইল চঞ্চল,
 পড়িলা নিমাই ভূমে হইয়া মুচ্ছিত,
 সোণার প্রতিমা, ছুই বাছ প্রসারিত ।
 আসিলা ছুটিয়া বৃদ্ধ ; ভাবিলা বিষয়—
 “একি রূপ ! একি ভাব ! মানবের নয় !
 কে এ যুবা ? একি কৃষ্ণ ? মম আবাহন
 এতদিনে হা কৃষ্ণ ! কি করিলে শ্রবণ ?
 পাপ পূর্ণ ধরাতলে আসিলে আবার ?
 হইবে কি দয়াময় ! পতিত উদ্ধার ?”
 ভাবেতে বিভোর বৃদ্ধ দেখিলা তখন,
 অনন্ত শয্যায় যেন শায়ী নারায়ণ ।
 আনি গঙ্গা জল, আনি তুলসী চন্দন
 নিমাইর পড়ি স্তব করিলা অর্পণ ।
 “গৌসাই ! গৌসাই ! হায় ! কি কর ! কি কর !”
 কহে কাঁদি গদাধর অশ্রু দর দর,
 “নিমাই পণ্ডিত, প্রভু ! বালক কেবল,

কেন তুমি কর তার হেন অমঙ্গল ?
 কহিলা ঈষদ হাসি ঋষি—“গদাধর !
 পরিচয় পাবে তুমি কিছুদিন পর,
 কেমন বালক এই নিমাই পণ্ডিত,
 এইরূপ, এই ভাব, দেবের বাঞ্ছিত ।”
 নিমাই কহিলা উঠি পাইয়া চেতন—
 “দেও মম শিরে প্রভু ! তোমার চরণ !
 হাবুডুবু খাইতেছি এ ভব সাগরে,
 আমাকে উদ্ধার কর করুণ অন্তরে ।
 হইয়াছে আজি মম বড় ভাগ্যোদয়,
 তোমার চরণে আমি লইলু আশ্রয় ।”
 একি দৈন্ত ! সবিস্ময় অদ্বৈত তখন
 কহিলেন প্রেম অশ্রু করি বরিষণ—
 “নিমাই ! তোমায় কৃপা হয়েছে ষাঁহার,
 চাহি আমি পাদপদ্মে আশ্রয় তাঁহার ।
 চল বৎস ! এই দৈন্ত কর সম্বরণ !
 আনন্দে মিলিয়া সবে করিব কীর্তন ।”

শ্রীবাসের আজিনায় পতিতপাবন
 উঠিল একুশে বঙ্গে প্রথম কীর্তন ।

নাচে ভক্তগণ ; বাজে করতাল খোল,
 উঠিতেছে ঘন ঘন “হরি হরিবোল ।”
 রোদন করিছে কেহ, কেহ গড়াগড়ি
 দিতেছে, মূর্ছিত কেহ ধরা তলে পড়ি ।
 হলুধনি, শঙ্খধনি, করে নারীগণ
 ঘন ঘন আনন্দাশ্রু করি বরিষণ ।
 নাহি জ্ঞান, অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ
 নিমাইর ; কখন বা করুণ ক্রন্দন ;
 কভু হাস্য অবিরাম ; আবার কখন
 বহে ঘর্ষা, দেহ যেন সুধা প্রস্রবণ ।
 কখন উত্তপ্ত দেহ, চন্দন শীতল
 হইতেছে শুষ্ক, কভু কম্প অবিরল
 হইতেছে, মহাশীতে দন্তের ঘর্ষণ,
 শরীর তুষার সিক্ত উজ্জল কাঞ্চন ।
 কভু পূর্ণ মূর্ছা, মুখে ফেণাবিনির্গত,
 নাহি শ্বাস, কভু শ্বাস ঝটিকার মত ।
 কভু অঙ্গ ভারি যেন ‘কাঞ্চন শিখর’,
 কভু লঘু স্বর্ণ-পুষ্পহার মনোহর ।
 ভক্তগণ লয়ে বক্ষে, লইয়া মস্তকে,
 নাচে বাহুজ্ঞানহীন প্রেমের পুলকে ।

নাচিছে নিমাই প্রেম-আনন্দে বিহ্বল
কভু শূত্রে, ধরাতলে কাঁপে ধরাতল ।
কভু দেয় হামাগুড়ি শিশু সুকোমল,
করে মুখবাদ্য কভু হাসে খল খল ।
নাচে ব্রজ শিশুভাবে আনন্দে বিহ্বল,
কভু নন্দ যশোদার বাৎসল্য সজল ।
শ্রীদাম সুদাম ভাবে নাচিছে কখন,
শামলী ধবলী বলি ডাকি ঘন ঘন ।
কভু নাচে কৃষ্ণ ভাবে প্রেমে আত্মহারা,
কভু রাধা ভাবে, বহে প্রেমে অশ্রু ধারা ।
সোণার পুতুল গৌর বেড়ি ভক্তদল,
নাচে বাহু জ্ঞানহীন ভক্তিতে বিহ্বল ।
আসক্যা প্রভাত হয় একুপে কীর্তন,
যামিনী পোহায় নাহি জানে ভক্তগণ ।
ক্রমে ক্রমে ভাবাবিষ্ট হতেছে নিমাই ;
থাকে কভু ভাবাবিষ্ট দিবা নিশি নাই ।
কভু কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট শ্রীবাসের ঘরে,
ভক্তগণে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করে ।
কভু বরাহের ভাবে মুরারির ঘরে
জলে পূর্ণ তাম্রঘট দশনাগ্রে ধরে ।

যে বা' ভাবি চাহে, দেখে সে ভাবে তখন,
সে ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে হয় অচেতন ।
জনরব শতমুখে করিল প্রচার,
আবিভূত নবদ্বীপে গৌর অবতার ।
গোড়, বঙ্গ, উৎকল, তৈলঙ্গ, মগধ
হইতে আসিল কত ভক্ত পারিষদ ।

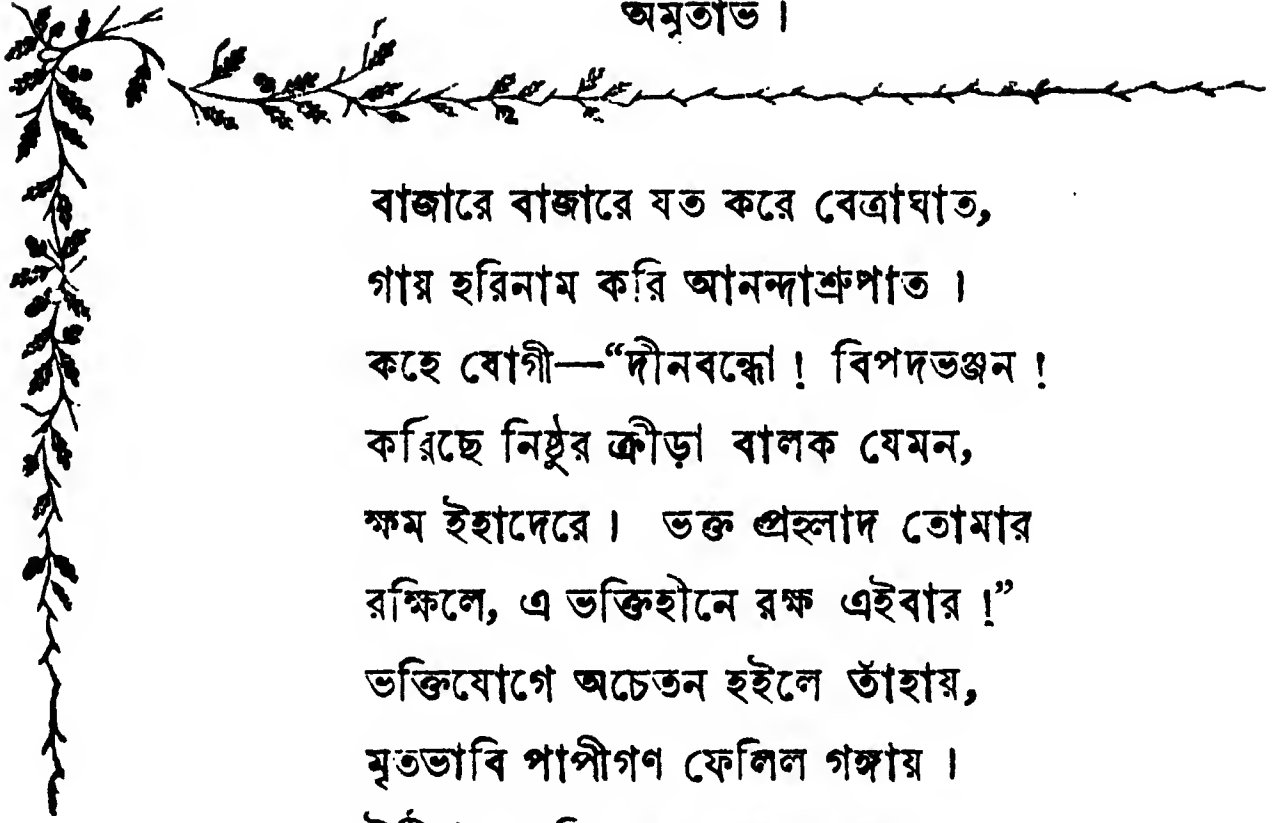
‘পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান’,
গায়ক মুকুন্দদত্ত গৌর-গত প্রাণ,
উভয়ের জন্মস্থান, দূর চট্টগ্রাম ;
এসেছেন পুণ্ডরীক নবদ্বীপ ধাম,
চলিল মুকুন্দ, সঙ্গে বন্ধু গদাধর,
দেখিলেন গদাধর বিস্মিত অন্তর ;—
কোথায় বৈষ্ণব ? এ যে বিলাসী পরম
বসিয়াছে পুণ্ডরীক, রূপে নিরূপম,
বহু মূল্যাসনে, বহু চাকর উপাধানে
হেলাইয়া চাকর বপু ; দক্ষিণে ও বামে,—
জ্যৈষ্ঠ মাস,—ছই ভৃত্য করিছে ব্যঞ্জন ;
সন্মুখে পাণের বাটা রজত নির্মিত ;

সকল জগত তুমি করিলে উদ্ধার,
আমি কি একাকী রূপা পাবনা তোমার ?”
“বাগ পুণ্ডরীক !”—প্রভু কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
কহিলা—“এসেছ বাগ ! এত দিন পরে !”
করিলেন পুণ্ডরীকে প্রেমে আলিঙ্গন,
উভয়ে মূর্চ্ছিত হ’য়ে পড়িলা তখন ।
উভয়ের প্রেমধারা বহে অবিরল
তিতিছে উভয়, ভক্ত বিস্মিত সকল ।

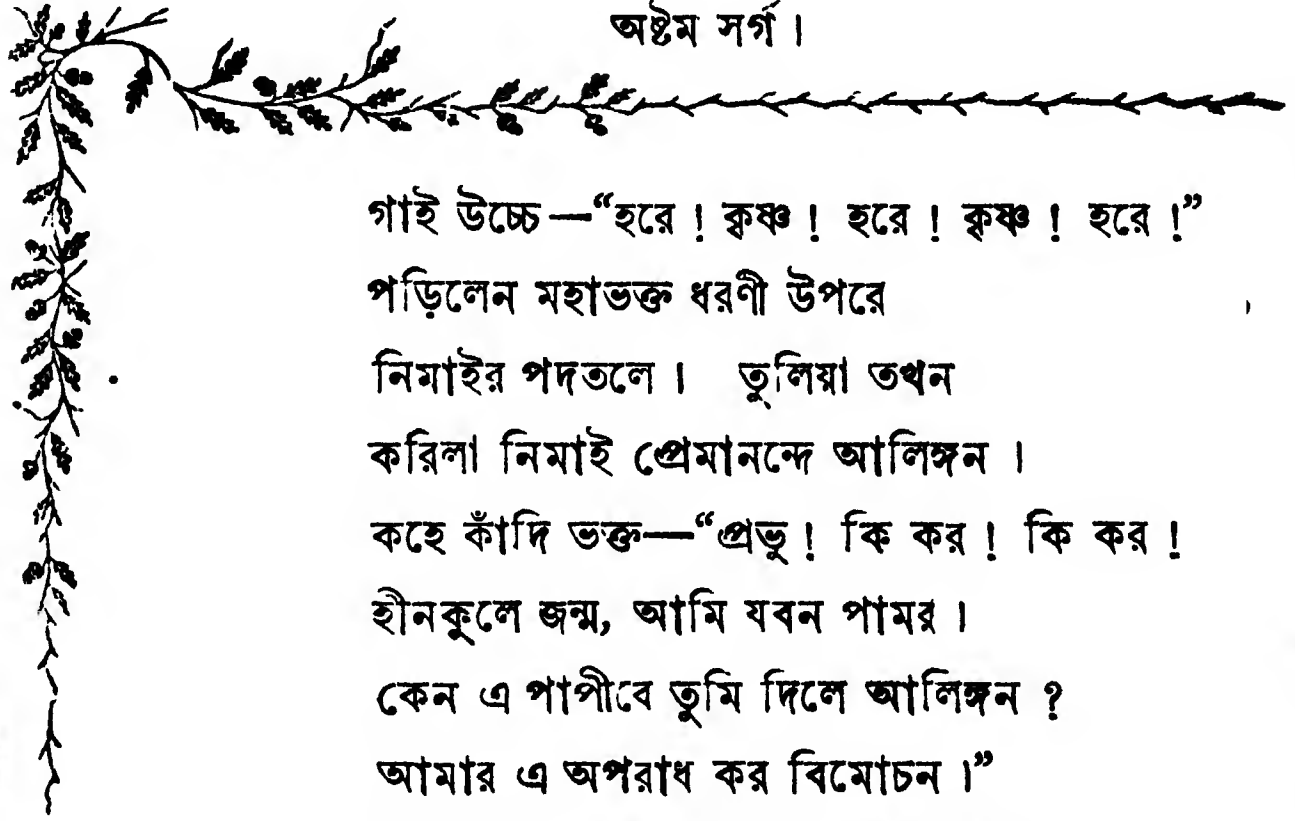
মহাভক্ত হরিদাস হেম কলেবর,
‘উজ্জ্বলা’ মায়ের নাম, পিতা ‘মনোহর’ ।
সুর নদীতীরে ভেটে কলাগাছি গ্রাম
হীনকূলে জন্ম, উপরি পূৰ্ব নাম । *
বেনাপোল বনে ক্ষুদ্র বাঁধিয়া কুটীর,
অপে লক্ষ নাম নিত্য ভক্তিতে অধীর ।
করিতে তপস্যা ভঙ্গ পাপী জমিদার
প্রেরিল রূপসী বেশা । চরণে তাঁহার
পড়ি অভাগিনী কাঁদে ; অহল্যা উদ্ধার

* জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।

করিলেন, পাণিনীকে দিয়া হরিনাম
 করিয়া কুটীর তার তপস্তার স্থান,
 মহাভাগবতোত্তম, কৃষ্ণ ভাবাবেশ,
 ঞ্জাডামাথা, কাঁধে কাঁথা, ভ্রমে দেশ দেশ ।
 অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা, দেহ লোমাক্ষিত,
 সরস্বতী বরপুত্র পরম পণ্ডিত ।
 পবিত্র চন্দন সম চরিত্র শীতল,
 সর্বভূতে দয়া, চিত্ত করুণা নিশ্চল ।
 নাহি আত্মপর ভেদ, জ্ঞাতিভেদ জ্ঞান
 জপে উচ্চে 'হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ' নাম ।
 পিতৃমাতৃহীন শিশু, যবন পালিত
 'বুড়নে' ; সে হরিনাম করে বিতরিত,—
 শুনিল গোরাই কাজী । ক্রোধেতে অধীর
 ধরিয়া আনিয়া ভক্তে, কহিলা—“ফকীর !
 পড় কল্যা, হিন্দুদের ছাড় হরিনাম !
 অগ্রথা কঠিন দণ্ড করিব বিধান ।”
 কহে ভক্ত—“খণ্ড খণ্ড কর দেহ প্রাণ,
 তথাপিও ছাড়িব না মুখে হরিনাম ।”
 কহে ক্রোধে গর্জি কাজী—“কাফের ইহা
 কর বেড়াঘাত বাইস বাজারে বাজারে ।”



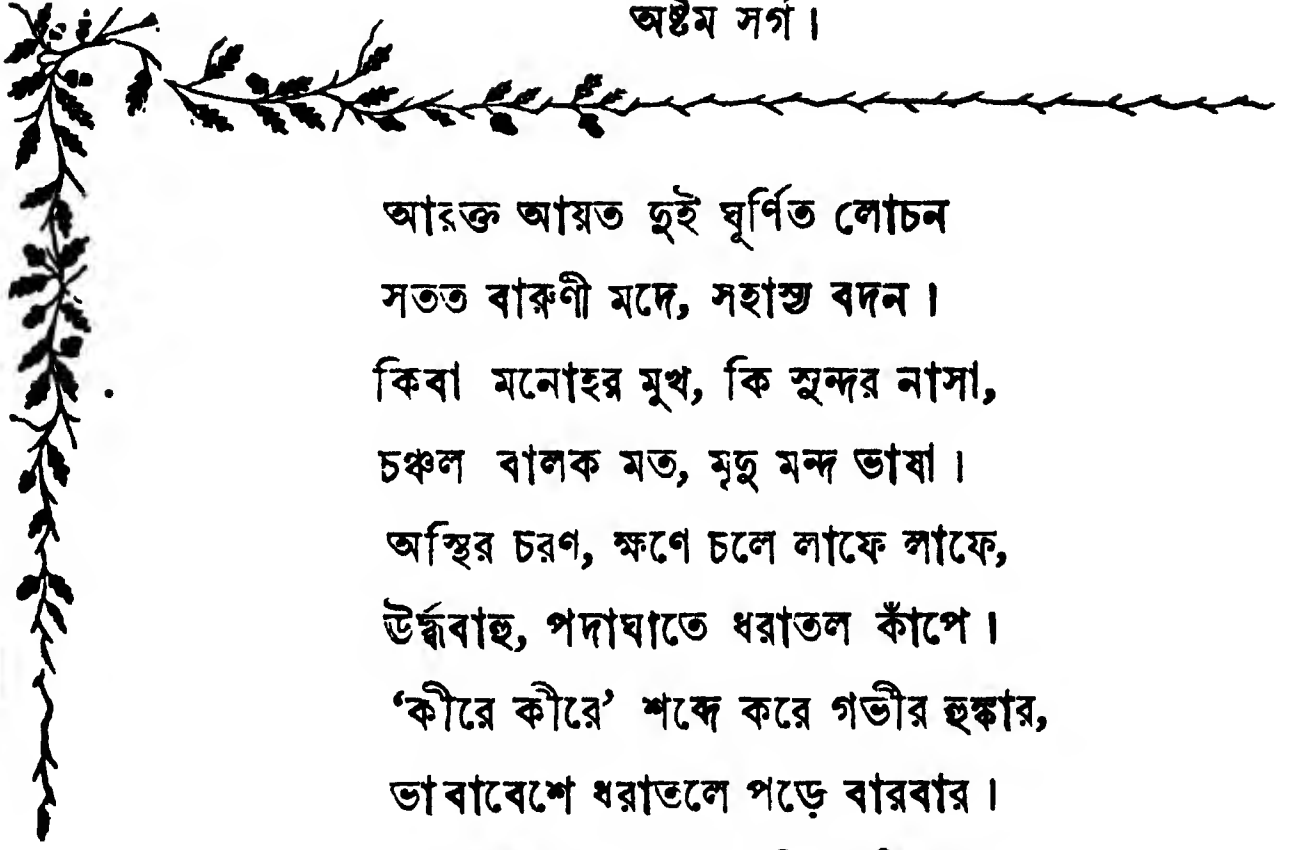
বাজারে বাজারে যত করে বেত্রাঘাত,
 গায় হরিনাম করি আনন্দাশ্রুপাত ।
 কহে বোগী—“দীনবন্ধো ! বিপদভঞ্জন !
 করিছে নিষ্ঠুর ক্রীড়া বালক যেমন,
 ক্ষম ইহাদেরে । ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার
 রক্ষিলে, এ ভক্তিহীনে রক্ষ এইবার !”
 ভক্তিযোগে অচেতন হইলে তাঁহার,
 মৃতভাবি পাপীগণ ফেলিল গঙ্গায় ।
 উঠিয়া সমাধি অন্তে ক্ষত কলেবরে
 ভাগীরথী তীরে ‘বট বৃক্ষের কোটরে’
 রহিলেন, নাহি জপি নিত্য লক্ষ নাম
 না করেন জিহ্বাগ্রেও বারিবিন্দু দান ।
 শুনিলেন নবদ্বীপে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ;
 উঠিয়াছে নবদ্বীপে হরিনাম গান ।
 আসিলেন নবদ্বীপে ; নাচিছে নিমাই
 দেখি ভাবে, আত্মহারা রহিলেন চাই ।
 কসিত কাঞ্চনকান্তি কিবা সমুজ্জল !
 যুগ্ম ভুরু, যুগ্ম নেত্র শতদল দল ।
 কি মহিমা অঙ্গে অঙ্গে, মাধুরী কোমল !
 বহিছে কি প্রেমগঙ্গা নেত্রে ছল ছল !



গাই উচে—“হরে ! কৃষ্ণ ! হরে ! কৃষ্ণ ! হরে !”
 পড়িলেন মহাভক্ত ধরনী উপরে
 নিমাইর পদতলে । তুলিয়া তখন
 করিলা নিমাই প্রেমানন্দে আলিঙ্গন ।
 কহে কাঁদি ভক্ত—“প্রভু ! কি কর ! কি কর !
 হীনকূলে জন্ম, আমি যবন পামর ।
 কেন এ পাপীবে তুমি দিলে আলিঙ্গন ?
 আমার এ অপরাধ কর বিমোচন ।”
 প্রভু কহে—“আজি মন পূর্ণ অভিলাষ ;
 হরিভক্ত ! তব নাম হ’লো হরিদাস ।
 তোমাকে লইয়া হৃদে, হৃদয় আমার
 হইল পবিত্র, তুমি ভক্তিপারাবার ।”
 শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিবাসে কহিলা নিমাই—
 “এমন আদর্শ ভক্ত ত্রিজগতে নাই ।
 ‘হরে কৃষ্ণ ! হরে কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে !
 হরে রাম ! হরে রাম ! রাম রাম হরে !’
 এই হরিনাম মন্ত্র করি বিতরণ
 হয়েছেন হরিদাস পতিত পাবন ।
 এই নাম মন্ত্র বিনা”—কহিলা নিমাই !
 “কলিকালে অন্য গতি নাই—নাই—নাই ।”

কহিলা মায়েরে ডাকি আনন্দে নিমাই—
“এমন অতিথি মাগো ! বড় ভাগো পাই ।
ষার ঘরে ভোজন করেন একবার,
সেই পুণ্যবান হয় সবংশ উদ্ধার ।”
দণ্ডবৎ পড়ি কাঁদি প্রভু পদতলে
কহে হরিদাস ভাসি নয়নের জলে—
“ঘৃণিত যবন আমি ; কহিলে এমন
আবার, গঙ্গায় প্রভু ! ত্যজিব জীবন ।
আমি নরাধম, তুমি দয়ার ঠাকুর,
আজি হ’তে আমি তব পাতের কুকুর ।
ভোজন পাত্রেই শেষ মম অভিলাষ,
দেও যদি, জানিব তোমার আমি দাস ।”

একদা নিমাই বসি সঙ্গে ভক্তগণ ;
মুকুন্দ ভারতী আসি প্রসন্ন বদন
কহে—“অবধূত এক, অপূৰ্ণ দর্শন,
আসিয়াছে নবদ্বীপে সঙ্গে শিষ্যগণ ।
তেজঃপুঞ্জ মহামূর্তি, মহামল্ল বেশ,
নাম নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দে আবেশ ।



আরক্ত আয়ত দুই ঘূর্ণিত লোচন
 সতত বারুণী মদে, সহাস্ত্র বদন ।
 কিবা মনোহর মুখ, কি সুন্দর নাসা,
 চঞ্চল বালক মত, মৃদু মন্দ ভাষা ।
 অস্থির চরণ, ক্ষণে চলে লাফে লাফে,
 উদ্ধবাহ, পদাঘাতে ধরাতল কাঁপে ।
 ‘কীরে কীরে’ শব্দে করে গভীর হুঙ্কার,
 ভাবাবেশে ধরাতলে পড়ে বারবার ।
 নন্দন আচার্য্য গৃহে করিছে বিশ্রাম ;
 ছুটিয়াছে নবদ্বীপ স্রোতে অবিরাম
 দেখিতে এ অবধূত । কহিছে সকলে
 ‘বিশ্বরূপ’—নবদ্বীপ পূর্ণ কোলাহলে ।”
 ছুটিলা নিমাই, সঙ্গে ভক্ত অনুচর ;
 দেখিলা, রহিলা স্থির চাহি পরস্পর
 চিত্তার্পিত প্রায় ; বহি অশ্রু দরদর,
 ভিজিতেছে উভয়ের বক্ষ কলেবর ।
 ভাবাবিষ্ট দুই ভাই, দুই ভাই পানে
 চেরে আছে, কি উচ্ছ্বাস উভয়ের প্রাণে !
 আবিষ্ট নিমাই দেখে সম্মুখে বিহার
 করিতেছে বলরাম মূর্ত্তি করুণার ।

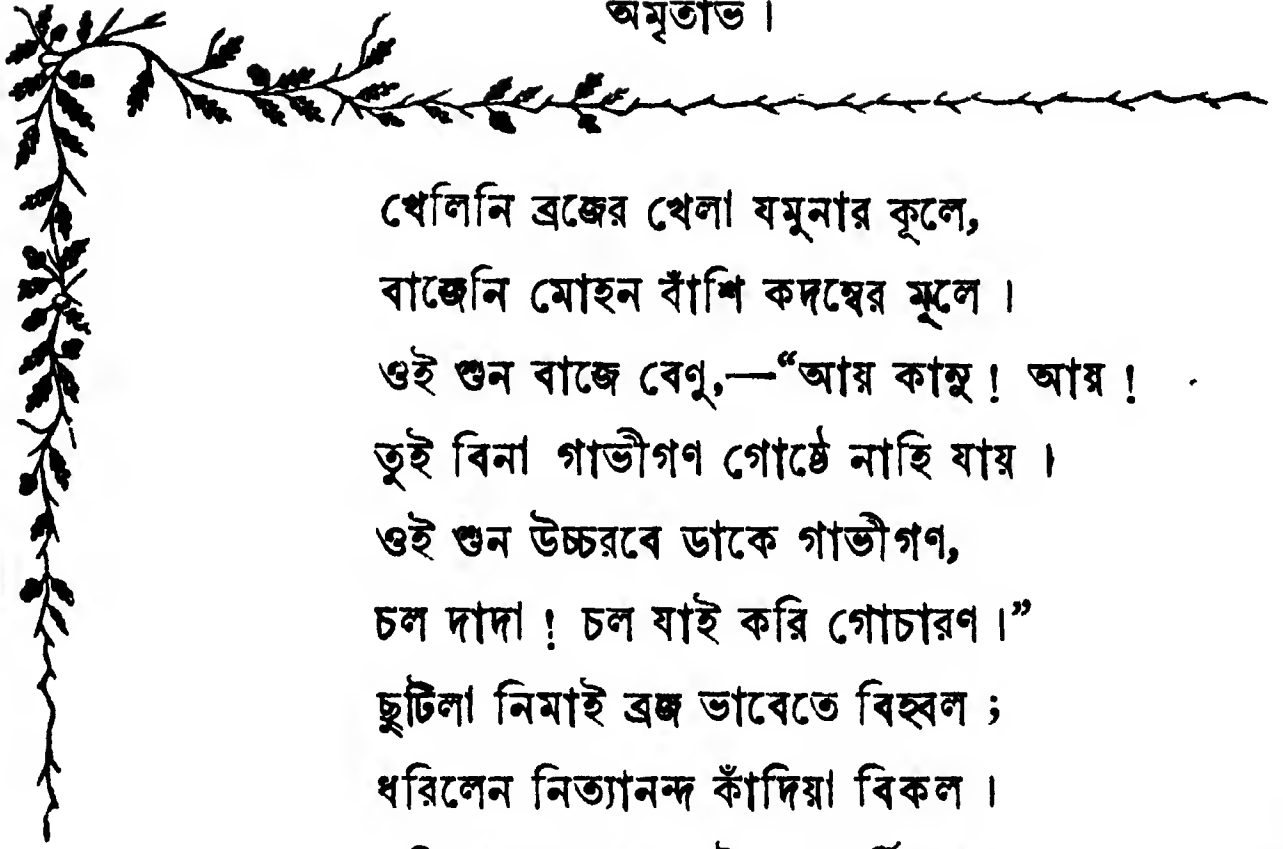
ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ করিছে দর্শন
ষড়ভুজ মহামূর্তি নয়ন রঞ্জন ।
শ্রীরামের দুই করে শোভে ধনুঃশর ।
শ্রীকৃষ্ণের দুই করে বংশী মনোহর ।
দেখিলেন নিত্যানন্দ নিমাইর কর,
সুবর্ণ বল্লরী, দণ্ড কমণ্ডলু ধর !
নাহি সেই কৃষ্ণবর্ণ বিজলি সঞ্চার
করিতেছে গৌর বর্ণে ভঙ্গি মহিমার !
কাঁদি নিত্যানন্দ কহে—“কা-কা-কা-কানাই !
কালরূপ কারে দিলি ? গৌর হ'লি, ভাই !”
“শ্রীপাদ ! শ্রীপাদ ! দাদা !”—কাঁদিয়া নিতাই
পড়িলেন বুকে, অন্ধে লইল নিমাই ।
দুই মহা প্রেমসিঙ্ধু হইল মিলিত
ভাঙ্গি বাঁধ, দুই ভাই হইল মুচ্ছিত ।
গলদশ্ৰু ভক্তগণ বোষ্টিয়া তখন
করিতে লাগিল মিলি, আনন্দে কীর্তন—

“কাল রূপ কারে দিলি ?

কা-কা-কা-কানাই ! তুই নাকি ভাই ! গৌর হলি ?
কাঁদায়ে যশোদা মায়ে শচী মাকে মা বলিলি ?
কাঁদাইয়ে বৃন্দাবন নবদ্বীপে উদয় হলি ?

পীতধড়া মোহন বাঁশি ভাইরে ! তুই কারে দিলি ?
কেন ধূলায় গড়াগড়ি, বনমালা কি করিলি ?”

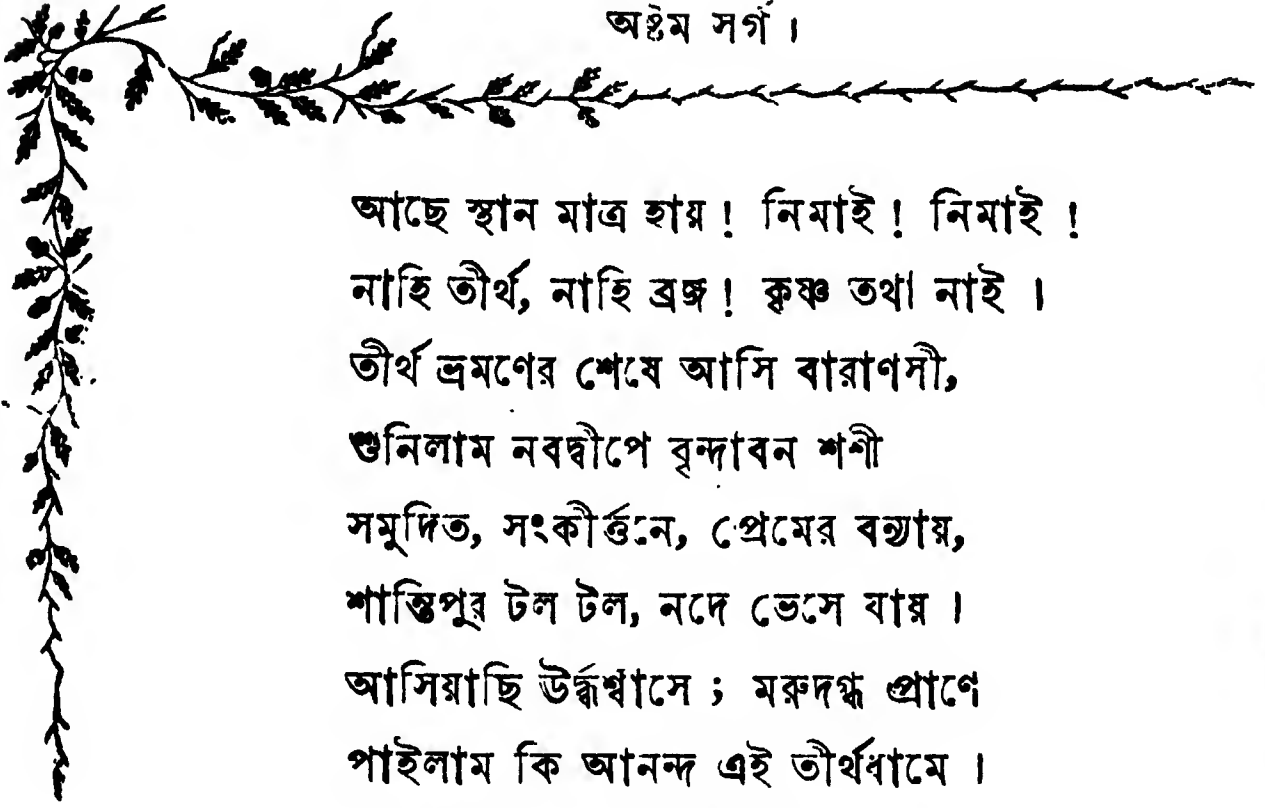
বহুদিনে তুই ভাই হইল মিলন ;
সিদ্ধু সুধাকর যেন করি আলিঙ্গন ।
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প হৃদ্য গর্জন,
ধূলায় লুণ্ঠন পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ।
কভু গলাগলি করি নাচিছে কীর্তনে
কৃষ্ণ বলরাম যেন দেখে ভক্তগণে
নাচিতেছে বৃন্দাবনে, প্রেমে আত্মহারা,
উভয়ের পদ্যনেত্রে বহে প্রেমধারা ।
আবিষ্ট কৃষ্ণের ভাবে কীর্তনে নিমাই
কহে কাঁদি ধরি গলা ;—“চল দাদা ! যাই,
চল বৃন্দাবনে, প্রাণ হয়েছে আকুল,
দেখি নাই বহুদিন কালিন্দীর কূল ।
দেখি নাই পিতা নন্দ যশোদা জননী,
দেখিনি ব্রজের সখা, ব্রজের সঙ্গিনী ।
দেখি নাই গোবর্দ্ধন গিরি মনোহর ;
দেখি নাই পুষ্পাকীর্ণ কানন সুন্দর ।



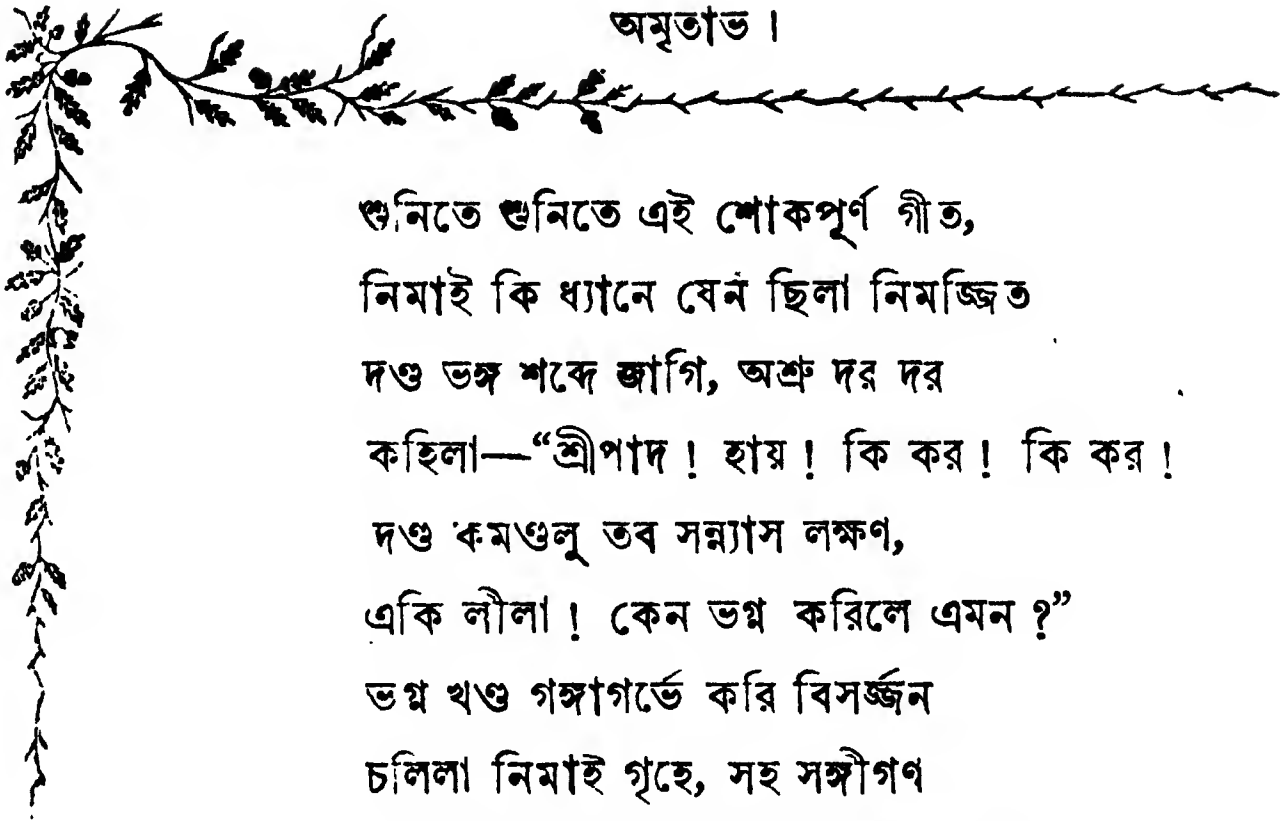
খেলিনি ব্রজের খেলা যমুনার কূলে,
 বাজেনি মোহন বাঁশি কদম্বের মূলে ।
 ওই শুন বাজে বেণু,—“আয় কান্থ ! আয় !
 তুই বিনা গাভীগণ গোষ্ঠে নাহি যায় ।
 ওই শুন উচ্চরবে ডাকে গাভীগণ,
 চল দাদা ! চল যাই করি গোচারণ ।”
 ছুটিলা নিমাই ব্রজ ভাবেতে বিহ্বল ;
 ধরিলেন নিত্যানন্দ কাঁদিয়া বিকল ।
 পড়িলেন ধরাতলে, উভয়ে মূর্ছিত,
 স্বর্ণ দেব মূর্তি দুই ভূকম্পে পতিত
 শুনি কর্ণে কৃষ্ণ নাম পাইয়া চেতন,
 নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করিয়া গ্রহণ,
 কহেন নিমাই কাঁদি—“বড় ভাগ্য মম,
 পাইলু এ পাদপদ্ম মহা তীর্থ সম ।
 করিয়া সন্মাস দীর্ঘ কৃষ্ণ প্রেম ধন
 পাইয়াছ, এ কনিষ্ঠে কর বিতরণ ।
 বড়ই কঠিন মম পাষণ্ড হৃদয়,
 কিছুতেই কৃষ্ণ প্রেমে দ্রব নাহি হয় ।
 শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি তোমাতে প্রচার,
 পার তুমি চতুর্দশ ভুবন উদ্ধার

করিতে, এ দাসে কৃপা কর দয়াময়,
 কৃষ্ণ প্রেম পিপাসায় কাতর হৃদয় ।”
 কহেন নিতাই, নেত্রে অশ্রু ছল ছল,—
 “ভ্রমিয়াছি আমি ভাই ! আসিছু অচল ।
 দেখিয়াছি ভারতের যেই দশা হায় !
 কহিতে নিমাই ! বুক বিদরিয়া যায় ।
 যবনের অত্যাচারে হয়েছে ধ্বংসিত
 ভারতের দেব দেবী মন্দির সহিত ।
 নাহি সোমনাথ, বেণীমাধব কাশীর,
 লুণ্ঠিত, চূর্ণিত, ছুই বিখ্যাত মন্দির ।
 যাদের পবিত্র চূড়া ছুঁইত গগন !
 বহিতেন সিন্ধু, গঙ্গা, করিয়া ধারণ
 যাদের পবিত্র ছায়া ; স্বয়ং রত্নাকর
 পূজিয়া অনন্ত রত্নে বিগ্রহ সুন্দর ।
 ভগ্নদেব দেহে, ভগ্ন মন্দিরে চূর্ণিত
 যবনের মসজিদ হয়েছে নির্মিত ।
 আছে যাহা, কি কহিব নিমাই ! নিমাই !
 আছে তীর্থ ধ্বংসশেষ, দেব দেবী নাই ।
 নাহি তীর্থ গুরু, পাপী মোহান্ত নিচয়,
 করিতেছে পৈশাচিক পাপ অভিনয় ।

পাণ্ডা ও পূজারিগণ পশু নির্কিঁশেষ,
 তীর্থবাসীগণ মহাপাপী ছদ্মবেশ ।
 ঘটয়াছে ব্রাহ্মণের কি ঘোর পতন,
 হইয়াছে ব্রাহ্মণেরা চণ্ডাল অধম ।
 ভারতে পণ্ডিত আছে, পাণ্ডিত্য বিহীন ;
 আছে শুক শাস্ত্র চর্চা ভক্তি-জ্ঞান-হীন ।
 শাস্ত্র ফল্গুনদ, সুধা বারি অন্তঃস্থিত,
 হইয়াছে স্বর্ণ হায় ! ভস্মে আচ্ছাদিত !
 ধর্ম জীব-হিংসা, কর্ম জীব-হিংসা আর ;
 ধর্ম ভেদ, জাতি ভেদ, দাণ্ডাগ্নি আকার
 জ্বালাইয়া নীতিভেদ, গৃহ ভেদ আর,
 সোণার ভারতবর্ষ করি ছারখার,
 করেছে আসিন্ধু গিরি ভস্মে পরিণত ।
 করিয়াছে যবনের গ্রাসে কবলিত ।
 নাহি কৃষ্ণ ; নাহি ধর্ম সাম্রাজ্য তাঁহার ।
 গ্রাসিয়াছে দ্বারাবতী মহা পারাবার ।
 হস্তিনা গঙ্গার গর্ভে ; ইন্দ্রপস্থ বন ;
 উড়িছে দিল্লীতে গর্বে যবন-কেতন ।
 মথুরা ও বৃন্দাবন অরণ্য ভীষণ,
 চিহ্ন ভগ্ন মন্দিরের ভূপ অগণন ।



আছে স্থান মাত্র হয় ! নিমাই ! নিমাই !
 নাহি তীর্থ, নাহি ব্রজ ! কৃষ্ণ তথা নাই ।
 তীর্থ ভ্রমণের শেষে আসি বারাণসী,
 শুনিলাম নবদ্বীপে বৃন্দাবন শশী
 সমুদিত, সংকীৰ্তনে, প্রেমের বন্তায়,
 শান্তিপুর টল টল, নদে ভেসে যায় ।
 আসিয়াছি উদ্ধ্বাসে ; মরুদন্ধ প্রাণে
 পাইলাম কি আনন্দ এই তীর্থধামে ।
 পাইলাম কৃষ্ণ, পাইলাম বৃন্দাবন,
 বুঝিলাম কলি-লীলা এই সংকীৰ্তন ।
 একবার কৃষ্ণনামে হইল উদ্ধার
 এ ভারত, বুঝিলাম হইবে আবার ।
 আবার মথুরা, আরবার বৃন্দাবন
 তুলিবে পবিত্র শির, চুম্বিয়া গগণ ।
 বুঝিলাম ব্রজপ্রেম প্রবাহে আবার
 ভাসিবে ভারত, জীব লভিবে উদ্ধার ।
 সাধুদের পরিভ্রাণ, ছঙ্কত দমন
 হইবে, হইবে পুনঃ ধর্মের স্থাপন ।
 শুষ্ক সন্ন্যাসের চিহ্ন রাখিব না আর—
 করিলেন দণ্ড কমণ্ডলু চুরমার ।



শুনিতো শুনিতো এই শোকপূর্ণ গীত,
 নিমাই কি ধ্যানে বেন ছিল নিমজ্জিত
 দণ্ড ভঙ্গ শব্দে জাগি, অশ্রু দর দর
 কহিলা—“শ্রীপাদ ! হায় ! কি কর ! কি কর !
 দণ্ড কমণ্ডলু তব সন্ন্যাস লক্ষণ,
 একি লীলা ! কেন ভগ্ন করিলে এমন ?”
 ভগ্ন খণ্ড গঙ্গাগর্ভে করি বিসর্জন
 চলিলা নিমাই গৃহে, সহ সঙ্গীগণ
 বেষ্টি নিত্যানন্দ, মাতৃপ্রেমে আত্মহারা
 বহিতেছে ছনয়নে অবিরল ধারা ।
 “বাপ বিশ্বরূপ মোর !”—কাঁদিয়া জননী
 মূর্ছিতা পড়িতেছিল, নিতাই অমনি
 “মা আমার ! মা আমার !”—কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
 লইলেন জননীকে হৃদয়ে কাতরে ।
 উভয় মূর্ছিত শোকে । কাঁদিছে নিমাই,
 কাঁদিছেন নরনারী, কথা মুখে নাই ।
 নিতাই চেতন পেয়ে দেখে জননীর
 নাহি কায়া, আছে ছায়া,—শোক সশরীর !
 “মা ! মা !”—বলি নিত্যানন্দ কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
 ডাকছেন আত্মহারা আকুল অন্তরে ।

অষ্টম সর্গ ।

“বাপ ! বাপ !”—ক্ষীণকণ্ঠে করিয়া ক্রন্দন
উঠিলেন শচীমাতা পাইয়া চেতন ।

লয়ে পুত্র শির বুক, চুম্বি শতবার
কহিলেন—“এতদিনে বাপরে আমার !
হুঃখিনী মায়েরে তোর পড়িল কি মনে ?
এতদিনে মা ! মা ! ডাক শুনিহু শ্রবণে ।

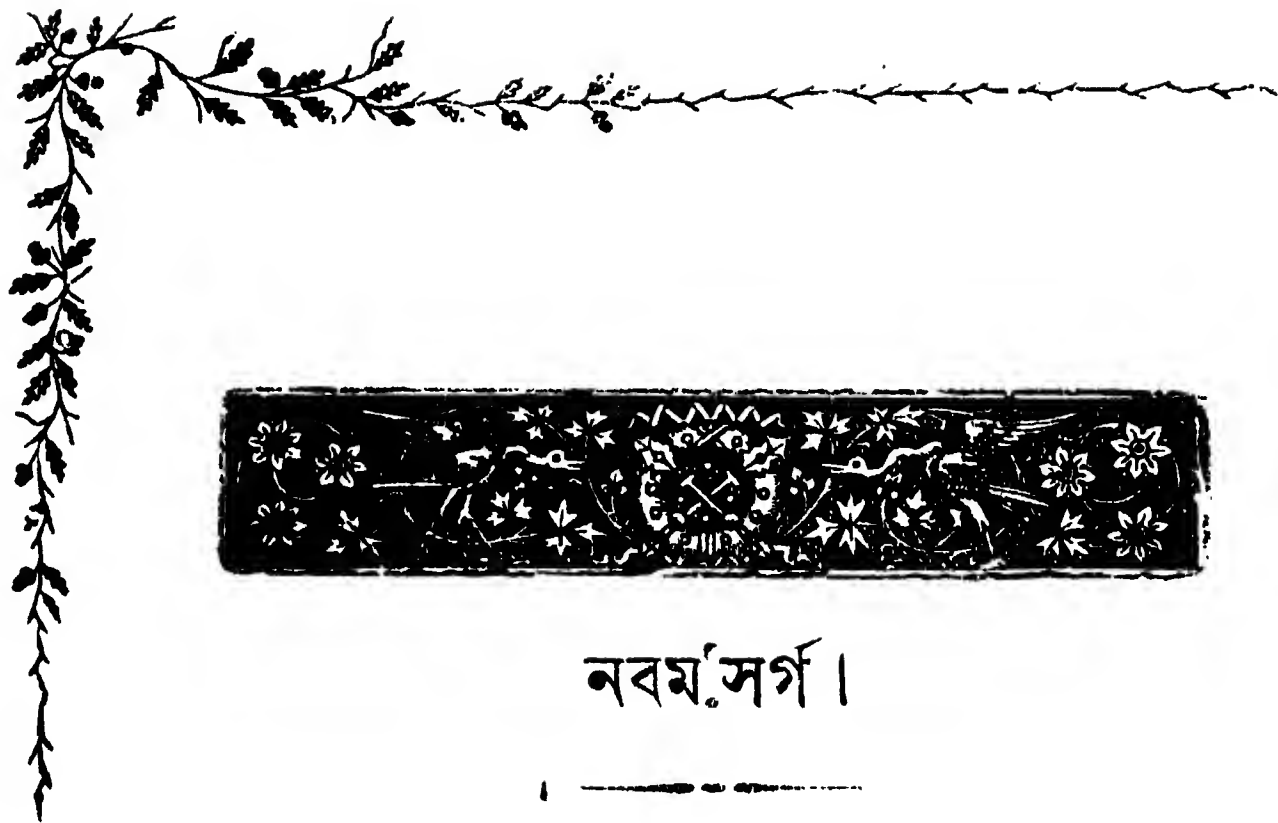
বার বৎসরের শিশু করিলি সন্ন্যাস,
কুড়িটি বৎসর গত,—দিনে কত মাস !
তোর শোকে পিতা তোর গেলা স্বর্গধাম ।
রয়েছি পাষাণী আমি,—বিধি মোরে বাম ।

এক বজ্রে হয় দৃঢ় শিলা বিদারিত,
কত শোক বজ্রে আমি রয়েছি জীবিত
নিমাইর মুখে বাপ ! দেখি তোর মুখ,
নিমাইর বুক বাপ ! ভাবি তোর বুক ।

নমাই ‘মা ! মা !’ বলি ডাকে যতবার,
ভাবিতাম বিশ্বরূপ ডাকিছে আমার ।
কেবা গুরু ? কিবা নাম ? নবনীত মোর !
কেমনে করিলে বাপ ! সন্ন্যাস কঠোর ?
“কেশব ভারতী গুরু”—ইঙ্গিতে নিতাই
কহিলেন জননীর অঙ্ক পানে চাই ।

“নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ গুরুদত্ত নাম,
 পূজি ‘গৌড়েশ্বর’ রাঢ়ে একচাকা গ্রাম,
 আনন্দে, ‘কুবের’ নাম করিয়া গ্রহণ,
 কৈশোরে সন্ন্যাস মাগো ! করিহু সাধন,
 মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়াই পণ্ডিত,
 উভয়ের গৃহে স্নেহে হইয়া পালিত ।
 ভ্রমিয়া সকল তীর্থ, আসিহু আবার
 মাগো ! এই পদ তীর্থ পূজিতে তোমার ।”
 মায়ের চরণে পড়ি মত্ত শিশু মত
 কহেন কাঁদিয়া—“মাগো ! থাকি দিনকত,
 এই পাদপদ্ম বক্ষে করিয়া ধারণ,
 এই রূপে প্রেমাশ্রিতে করি প্রক্ষালন,
 জুড়াব সন্ন্যাসদণ্ড কঠোর জীবন,
 জননী ও জন্মভূমি করি দরশন ।”
 মুছি নয়নের অবিরল অশ্রুধারা
 কহিলেন শচীমাতা—“নয়নের তারা
 এই অভাগীর বাপ ! তোরা দুটি ভাই ;
 তোমাকে সন্ন্যাসী দেখি বড় হুঃখ পাই ।
 ধর বজ্রমূত্র, কর বিবাহ এখন,
 কুড়ি বৎসরের অশ্রু কর বিমোচন

জননীর, গৃহ সূথে থাক দুইজন,
 যদবধি অভাগিনী মুদি ছনয়ন ।
 হৃদয় মৃগাল শুষ্ক করিয়া জীবিত,
 থাক দুই ভাই দুই পদ প্রস্ফুটিত ।
 একে আমি দক্ষ বাপ ! সন্ন্যাসে তোমার,
 তাতে তব ক্ষেপা ভাই,—ভাবনায় তার
 হইয়াছি ঝড়-দাব-দক্ষ-বন মত,
 রক্ষা কর তারে, কাছে থাকিয়া সতত ।
 কর সংকীৰ্ত্তন, প্রেমে নাচ দুই ভাই
 নিমাই নিতাই মোর কাণাই বলাই !
 দিয়া হরিনাম কর জীবের উদ্ধার,
 ততোধিক ধর্ম্য বাপ ! কিবা আছে আর ?”
 “মা আমার ! মা আমার !”—উচ্ছ্বাসে তখন
 কহিলা নিতাই কাঁদি—“করিব পালন
 আজ্ঞা তোর, আজি মম খুলিল নয়ন,
 পাইল এ পুত্র তোর নবীন জীবন ।
 দুই ভাই উদ্ধারিতে পারি যেন নর
 শিরে দিয়া দুই কর আশীর্বাদ কর !”
 হাসিলা নিমাই,—অন্ত বিস্মিত সবাই,
 কি কথা ! সন্ন্যাস-ভ্রষ্ট হইবে নিতাই !



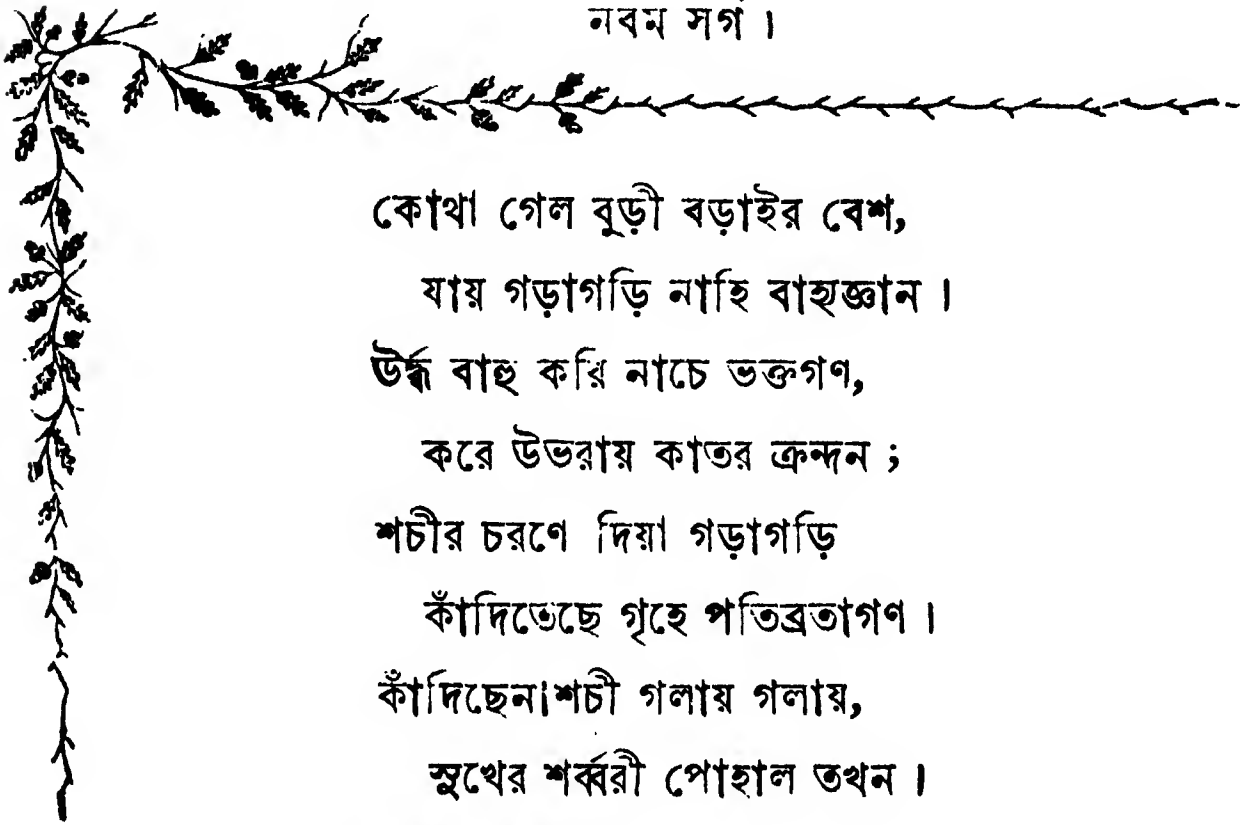
নবম সর্গ ।

পাষণ্ড ।

একদা কহিলা নিমাই হাসিয়া,
করিব কীৰ্ত্তনে লীলা অভিনয়,
প্রভু মাসীপতি চন্দ্রশেখরের
আলয়ে মিলিল নরনারীচয় ।
আসিলেন শচী সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া,
আসিলা সকল ভক্ত পরিবার ।
উঠিল বাজিয়া খোল করতাল
মন্দিরার সহ মেঘমল্লিকার ।
মুকুন্দের কণ্ঠ উঠিয়া গগনে
নৈশ শান্তি বক্ষে সুধার রাশি

ঢালিছে, বাজিছে ব্রজকুঞ্জবনে
 নীবিড় নিশীথে শ্রামের বাঁশি ।
 উদ্ধ্বাসে আসি বহু প্রতিবাসী
 দেখে আগ্নিনার পড়েছে দ্বার ;
 কেহ গেল চলি দিয়া বহুগালি,
 রহে বহু বসি শুনিতে আর ।
 সাজে হরিদাস বৈকুণ্ঠ কোটাল,
 ছই মহা গৌড় বাতাসে উড়ি,
 রমা গদাধর শ্রীবাস নারদ,
 সাজিলা নিতাই বড়াই বুড়ী ।
 কৃষ্ণগী-হরণ হবে অভিনীত
 নিমাই কৃষ্ণগী বিহ্বল হৃদয় ।
 অত্রে কি চিনিবে, নিজের শচী মাতা
 না চিনে, বিস্ময়ে চাহিয়া রয় ।
 কৃষ্ণগীর ভাবে হইয়া বিভোর,
 লিখিছেন পত্র নয়নজলে,
 পত্র ধরাতল, অঙ্গুলি লেখনী,
 কৃষ্ণ কামানল হৃদয়ে জ্বলে ।
 পড়িছেন পত্র,—কি কণ্ঠ করুণ !
 প্রেম-কাতরতা করুণ কেমন !

প্রেমে আত্মহারা শুনি নরনারী,
দেখি কাতরতা, শুনিয়া ক্রন্দন ।
সে কাতর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া
গাইছে মুকুন্দ দ্রবিয়া পাষণ ;
ভাবেতে বিহ্বলা উঠিয়া কুন্নিণী
নাচিছে ঢলিয়া নাহি কিছু জ্ঞান ।
কখন জিজ্ঞাসে—“কৃষ্ণ কি আসিলা ?
কহ দ্বিজ কহ করুণা করি ।
দেখি কৃষ্ণ কভু বিদর্ভের বালা,
হাসিছে সখীর গলায় ধরি ।
বহে ছনয়নে আনন্দের ধারা
বহিতেছে যেন গঙ্গা মূর্তিমতী ।
কভু অটু অটু হাসিছে সুন্দরী
উন্মাদিনী প্রেম-বিধুরা সতী ।
ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিছে কুন্নিণী,
ঢলিয়া ঢলিয়া ভূতলে পড়ি ;
বহিতেছে বহু নর-নারী-নেত্রে
দেখ রূপ লীলা তরঙ্গ মরি !
মূর্ছিত হইয়া পড়িলা ভূতলে
নিত্যানন্দ যেন মুরতি পাষণ ।



কোথা গেল বুড়ী বড়াইর বেশ,
 যায় গড়াগড়ি নাহি বাহুজ্ঞান ।
 উর্দ্ধ বাহু করি নাচে ভক্তগণ,
 করে উভরায় কাতর ক্রন্দন ;
 শচীর চরণে দিয়া গড়াগড়ি
 কাঁদিতেছে গৃহে পতিব্রতাগণ ।
 কাঁদিছেন শচী গলায় গলায়,
 স্নুথের শর্করী পোহাল তখন ।
 বঙ্গেতে পবিত্র যাত্রা অভিনয়,
 হইল স্মৃতিত একুপে প্রথম ।
 এখনো বঙ্গের গায়ক সকল,
 —চারিশত বর্ষ হয়েছে অতীত,—
 যাত্রার আরম্ভে নমি গৌরচন্দ্রে,
 গায় প্রেমে ‘গৌর চন্দ্রিকা’ গীত ।

বাহিরে বসিয়া শুনিল যাহারা,
 তারাও ভক্তিতে বিহ্বল হৃদয়
 চলিল আলায়ে করি হরিধ্বনি,
 করি নবদীপ হরিধ্বনিময় ।

এইরূপে একদিকে নবদ্বীপে
ছুটিল ভক্তির প্রবাহ বহুবার,
আসে দিবানিশি স্রোতে নরনারী
করিতে দর্শন, দিতে উপহার ।
অন্যদিকে ঘোর তিংসা পাপিষ্ঠের
ছুটিল প্রবাহে বৈতরণী মত ;
ক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পণ্ডিত মণ্ডল,
কত মতে তিংসা করে অবিরত ।
গঙ্গাঘাটে তর্করত্ন পঞ্চানন,
দুই মহামূর্খ পণ্ডিতদ্বয়,
বসিয়া আঁহিকে জপিতে জপিতে
তর্করত্ন দুই ডাকিয়া কয়—
“দেখ পঞ্চানন ! নিমায়ে বেটার
বাড়াবাড়ি আর সহ্য নাহি যায়,
উপাধি ত নাই, তথাপি পণ্ডিত,
আমাদের অন্ত মিলিবে কোথায় ?
আপন শরীরে আছে নিরঞ্জন,
আর কারে ডাকি করিয়া চীৎকার ।
শুনেছি ইহারা সব নাকি খায়,
এই জন্ত দূঢ় করে রুদ্ধদ্বার ।”

গায়ত্রী জপিতে কহে পঞ্চানন—

“কীর্তন সন্দর্ভ বুঝ না কি আর ?

পঞ্চ কত্ৰা পঞ্চ মকার আনিয়া

করে সারা রাত্রি আনন্দে বিহার ।”

ত্ৰাস শেষ করি তর্করত্ন কহে—

“ঠিক কথা, ভায়া ! এ যুক্তি সুন্দর !

না থাইলে মদ, পারে কি বা কেহ,

চৈঁচাতে একপে আটটি প্রহর ?”

কহে পঞ্চানন মুদ্রা করি কর,—

“চৈঁচান কেমন ! পটুয়া শ্রীধরে,

মহা চাষা বেটা পেটে নাহি ভাত,

সারাটি রজনী চৈঁচাইয়া মরে ।

“হরে ! কৃষ্ণ !”—বলি করে যে চীৎকার,

নাহি সাধ্য কোনো পড়সি ঘুমায় !

ছপদাপ করি পড়ে ভূমিতলে,

“মৈল বেটা”—বলি লোক ছুটে যায় ।”

সূর্য্যে অর্ঘ্য দিয়া তর্করত্ন কহে—

শ্রীবেসের বাড়ী দেখ গিয়া আর !

নিত্য দুর্গোৎসব ; দধি দুগ্ধ দ্বত

ফলমূল মণ্ডা আসে ভারে ভার ।

চেষ্টায়ে চেষ্টায়ে হরি ! হরি ! হরি !

বাড়ায় নিশিতে উদর-অনল ;

দিনে হই হই হেউ হেউ হেউ,

ছড়া ছড়ি মাত্র শুনিবে কেবল ।

শুধু দেও দেও, শুধু খাও খাও,

মনে মনে মণ্ডা মিঠাই খায়,

লুচি মালপোয়া, কি কহিব আর,

দ্রৌপদীর বস্ত্র, অন্ত নাহি তায় ।

মহা মহা ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে

সহস্রে সহস্রে বিদায় সম্বল ;

নিমায়ে বেটার এই রাজভোগ,

আমাদের বল বাঁচিয়া কি ফল ?

ওই দেখ বেটা টলিয়া টলিয়া

আসে গঙ্গাস্নানে নেশায় ভোর ।

হয়েছে নিশিতে রুক্মিণী-হরণ,

আসিছেন ওই রুক্মিণী-চোর ।”

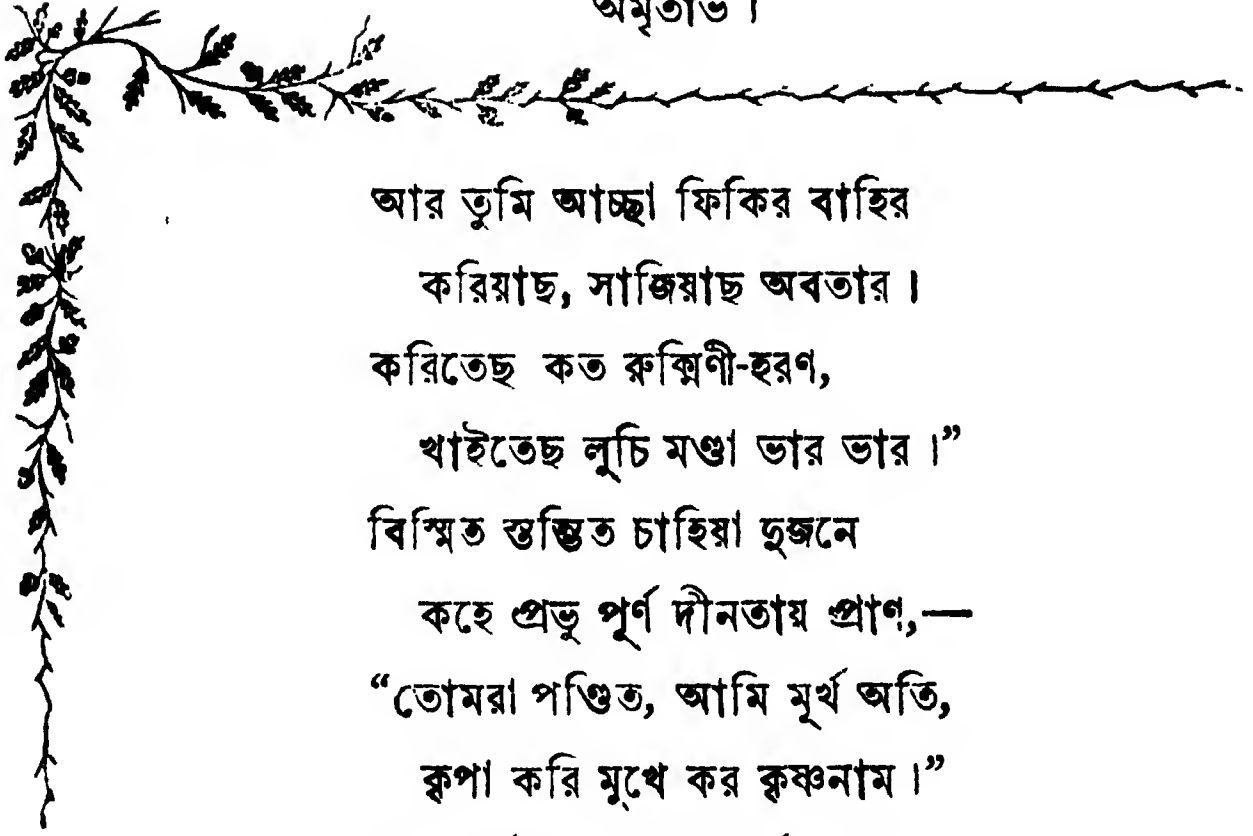
ফেলিয়া আত্মিক উঠিয়া ছজন,

বাঁধি নামাবলি উদরে স্থল,

গড়াইয়া বেন গিয়া কহে ক্রোধে—

“তুমি কি এ দেশ করিবে নির্মূল ?

একি কাণ্ড তব ? আটটি প্রহর
ঠেঁচাইয়া খোল, করিয়া চীৎকার,
আপনি ত মর, পাড়া প্রতিবাসী
নিদ্রা যাবে স্মৃতে সাধ্য আছে কার ?
ব্রাহ্মণের বল নৃত্যগীত ধর্ম,
আছে কোন্ শাস্ত্রে ? সত্য নিরঞ্জন
আছেন অন্তরে, কর তাঁরে ধ্যান,
মর চেঁচাইয়া কিসের কারণ ?
এ দেখ আমরা বসি এতক্ষণ
করিলু আহুক করি তাঁর ধ্যান ;
মর যণ্ড মত চেঁচাইয়া কেন ?
তোমার হরির নাহি কি কাণ ?
ক্রোধে পঞ্চানন কহে টিকি নাড়ি—
“রাজ্য ছাড়া এক আনিয়া কীর্তন,
চেঁচায়ে চেঁচায়ে শয়নস্থ হরি,—
ভাঙ্গিল তাঁহার নিদ্রা ছুটগণ ।
করি ক্রোধ তিনি হরিলেন বৃষ্টি,
ধান মারা গেল, ছুর্ভিক্ষে উজাড়
হইল এ দেশ ; দশ ক্রোশ হাঁটি
না পাই আমরা বিদায় আর ।



আর তুমি আচ্ছা ফিকির বাহির
করিয়াছ, সাজিয়াছ অবতার ।
করিতেছ কত ক্লিন্নী-হরণ,
খাইতেছ লুচি মণ্ডা ভার ভার ।”
বিস্মিত স্তম্ভিত চাহিয়া দুজনে
কহে প্রভু পূর্ণ দীনতায় প্রাণ,—
“তোমরা পণ্ডিত, আমি মূর্থ অতি,
কৃপা করি মুখে কর কৃষ্ণনাম ।”
কহে তর্করত্ন—“ওরে মূর্থ ! নাম
ছাড়িয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার,
আমরা পণ্ডিত মহা উপাধ্যায়,
কেন বল নাম লইব কেষ্ঠার ?
নাহি প্রয়োজন ক্লিন্নী হরণ,
নাহি চাহি বস্ত্র করিয়া হরণ
দেখিতে উলঙ্গ রমণীর রূপ,
করিতে নির্জনে রাস ব্যভিচার ।
মহা শাক্ত স্থান এই নবদ্বীপ,
প্রাণান্তেও নাম লব না তার ।
রাস-পূর্ণিগায়,—তোর মুখে চুণ !—
‘রাসকালী’ পূজা করিব প্রচার !”

কাণে দিয়া হাত পড়িয়া চরণে
কহে প্রভু পুনঃ দীন ত্রিয়মাণ,—
“আমি মূর্খে কৃপা করি একবার,
বল দুই জনে মুখে কৃষ্ণ নাম ।”
“বটে ! বটে ! বটে ।”—গর্জি পঞ্চানন,
এই উপহাস তোর বার বার
জলে অঙ্গ, তুই জানিস্ কি মূর্খ
জগাই মাধাই শিষ্য যে আমার ?
এই চলিলাম তাহাদের কাছে,
যাইব কাজির দেয়ানে আর ।
দেখি তোর ঘাড়ে আছে কটি মাথা,
ধরে কটি মাথা গৌর অবতার ।”
“শুধু তাহা ?” গর্জি কহে তর্করত্ন,—
“জানিস্ আমরা দলপতিদ্বয়,
দিস্ তুই তবে উচ্ছিষ্ট কুকুরে,
বাসি মড়া শচী বুড়ী নাহি হয় ।”
দুই মহা শিখা নাড়িয়া নাড়িয়া,
চলিল দুইটি প্রকাণ্ড উদর ।
রহিল নিমাই বিস্মিত স্তম্ভিত,
অধোমুখে যেন মুরতি প্রসূর ।

আসিছে নিতাই ভক্তগণ সহ,
কহে তর্করত্ন—“দেখ পঞ্চানন !
ওই আসিতেছে অবধূত বেটা,
দুরন্ত মাতাল, টলিছে চরণ !”
“বটে ষণ্ডামার্ক !”—গর্জিয়া নিতাই—
“থাক ! মহাশুদ্ধি * হইবি আমার !”
ছুটি গিয়া চাপি কলসির মত
বসাইয়া উঠে কাঁধে দুজন্যার ।
“ব্রহ্মহত্যা ! ব্রহ্মহত্যা !”—দুইজন,
করিছে চীৎকার উপরে চীৎকার ।
“গোহত্যা ! গোহত্যা !” নিতাই চীৎকার
করি কহে—“চল বলদ আমার ।”
“কি কর শ্রীপাদ ! কি কর ! কি কর !”—
ছুটিলা অদ্বৈত, শ্রীবাস, নিমাই ।
“গ্ৰীবা নিষ্পীড়ন”—কহে দুপণ্ডিত ;
“গোচারণ”—কহে হাসিয়া নিতাই ।
হাসে ঘাটে ঘাটে নরনারীগণ,
হাসে শিশুগণ দিয়া হাততালি ;

* তান্ত্রিকের মদের চাট্ ।

ছুটে বাচস্পতি স্মৃতিরত্নগণ,
 দিয়া অভিধান বহিভূত গালি ।
 কিন্তু ভয়ে কেহ নাহি যায় কাছে,
 দেখি নিতাইয়ের ঘূর্ণিত নয়ন ।
 একে কাঁধে চড়া রোগ নিতায়ের,
 ব্রজগোপ ভাবে বিভোর এখন ।
 চরণে পড়িয়া কাঁদিলে নিমাই,
 উঠিল নিতাই ত্যজি দৃঢ়াসন ।
 “গ্রীবা নিপ্পীড়িত”—কহে তর্করত্ন ;
 “অস্থি বিচূর্ণিত”—কহে পঞ্চানন ।
 রাখালের ভাবে নিতাই বিভোর,
 নাচিয়া নাচিয়া চলিল তখন ।
 “উঠ ! ভায়া উঠ !”—কহে পণ্ডিতেরা ;
 “নিষ্পেষিত !”—কহে পণ্ডিত দুজন ।
 শিখায় শিখায় এমনিই গিরা
 দিয়াছে নিতাই, খোলে সাধ্য কার ?
 শেষে পণ্ডিতেরা কাটি ছুই শিখা,
 করে বিসর্জন গর্ভেতে গঙ্গার ।
 মহা হলুহলু পণ্ডিত মণ্ডলে,
 ছেঁড়া গামছাখানি কটিতে আঁটি,

কেহ কহে,—মার, কেহ—বাড়ী লুঠ,
কেহ কহে—তার পোড়াও বাটী ।
স্নানান্তে নিমাই আসিছেন গৃহে,
বিষন্ন বদন চিন্তাকুল মন ;
আসি বাচস্পতি কহে—“বাপু ! শুন !
তোমার হিতৈষী আমি অনুক্ষণ ।
তর্করত্নটার ‘গর্ভরত্ন’ নাম,
কত অপগর্ভ গৃহে আপনার !
বন্ধু তার ‘ঘর পোড়া পঞ্চানন’
অগ্নি পুরাণেতে সিদ্ধ হস্ত তার ।
নাহি ধরাতলে হেন মহাপাপ
এ দুজন যাহা করিতে অক্ষম ;
কিন্তু আমি তব থাকিলে সহায়
দস্তে তৃণ তারা করিবে গ্রহণ ।
কর তুমি কিছু অর্থ অপব্যয়,
জান পণ্ডিতেরা অর্থের কান্দাল ;
দিও তুমি আর আমাকে যা খুসি,
ঘুচাইব আমি সকল জঞ্জাল ।
দেখি কার সাধ্য করে দলাদলি !
আর দেখ বাপু !”—কহে কাছে আসি,—

আছে কত্না মম বিধবা ষোড়শী,
পরম রূপসী, কর সেবাদাসী !”
“কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !” বলি কর্ণে দিয়া হাত,
চলিলা নিমাই খেদে মুখ ভার ।
বৃথা খেদ প্রভু ! পাপের উত্থান
না হইলে তুমি আসিতে কি আর ?

সে নিশি কীর্তনে গভীর বিষাদ,
দেখিল সকলে, শ্রীমুখে ভাসে ;
পরদিন প্রাতে প্রভু ভাবাবেশে
কহিলেন নিত্যানন্দ হরিদাসে—
“শ্রীপাদ ! তোমরা ঘরে ঘরে গিয়া
করি প্রেমানন্দে ভিক্ষা কৃষ্ণনাম,
করি এইরূপে নাম বিতরণ,
মহাপাপীগণে কর পরিত্রাণ ।
অঙ্গের কলুষ হয় প্রক্ষালিত
যেই রূপে পূণ্য-প্রবাহে গঙ্গার,
তোমাদের প্রেম-প্রবাহে তেমতি,
কর প্রক্ষালিত কলুষ আত্মার !”

প্রেমাবেশে নিত্যানন্দ হরিদাস
 কহে ঘরে ঘরে—“কর ভিক্ষা দান !”
 ভিক্ষা দিলে গৃহী, না লইয়া তাহা,
 কহে—“চাহি ভিক্ষা বল কৃষ্ণ নাম !”
 দুই মহাযোগী প্রেমেতে পাগল,
 দেখি নরনারী, শুনি কৃষ্ণ নাম,
 দেয় গড়াগড়ি পড়িয়া চরণে,
 বহে প্রেমধারা গায় নাম গান ।
 গেলে পণ্ডিতের বাড়ী কহে ক্রোধে—
 “বটে ! শাক্ত আমি লব কৃষ্ণ নাম ?
 মার বেটাদেরে ! ক্ষেপেছে আপনি
 ক্ষেপাইছে আর নবদ্বীপ ধাম ।”
 কেহ কহে—“এরা ডাকাতির চর,
 ফিরে বাড়ী বাড়ী করিয়া ছল ।
 মানুষ একরূপ পারে কি কাঁদিতে ?
 কাজির নিকটে ধরে নিয়ে চল ।”

একপেে দুজনে নিত্য ঘরে ঘরে,
 কহে—“কহ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ আর ।”

উঠে নবদ্বীপে হরি নাম রোল,
বহে নবদ্বীপে ভক্তি পারাবার ।
এক দিন পথে দেখেন ছজন
ঘোর মদ্যপায়ী পাপী ছরাচার,
পথে উঠি পড়ি যায় গড়াগড়ি,
যারে পায় তারে করিছে গ্রহার ।
কভু ছই জন করে কোলাকুলি,
কভু চুলাচুলি গালাগালি আর,
কভু মারামারি করে ছই জনে,
গিলাচের মত করিয়া চীৎকার ।
ভয়ে পথিকেরা দাঁড়াইয়া দূরে,
দেখিছে এ দৃশ্য শুষ্ককণ্ঠে চাই ।
কহেন নিতাই,—“জান কে ইহারা !”
কহে পথিকেরা—“অগাই মাধাই !”
ব্রাহ্মণ-সন্তান ভাই ছই জন,
মহাকুলে জন্ম মহা কুলজার ;
নাহি হেন পাপ না করে ইহারা—
চুরি গৃহ-দাহ হত্যা ব্যভিচার ।
অর্থে কাজি বশ ; আছে দস্যুদল
ইহাদের, করে ঘোর অত্যাচার ।

ভয়ে নবদ্বীপ নিদ্রা নাহি যায়,
পথ নাহি চলে ; দেশে হাহাকার ।”
করুণ হৃদয় নিতাই তখন
কহে আগে গিয়া—“বল কৃষ্ণ ভাই !
ভজ কৃষ্ণ আর ! ছাড় পাপাচার,
বিনা কৃষ্ণ নাম পরিজ্ঞান নাই ।”
মাথা তুলি চাহে ক্রোধে ছুই ভাই
মদিরায় রক্ত অরুণ লোচন ।
“ধর ! ধর !”—বলি ছোটো ধরিবারে,
ধায় প্রাণ ভয়ে সন্ন্যাসী ছজন ।
নর নারীগণ করি হাহাকার
কহে সব—“হায় ! মরিল সন্ন্যাসী ।”
“ভণ্ডের উচিত হবে শাস্তি আজি ।”—
কহে পণ্ডিতেরা মহানন্দে হাসি ।
মদিরা বিক্ষেপে জগাই মাধাই
পড়িল, উঠিতে সাধ্য নাহি আর ।
স্থল দেহ নিত্যানন্দ হরিদাস,
দাঁড়াইলা, খাস বহে দৌহাকার ।
কহেন নিতাই—“ভালই বৈষ্ণব
হইল ইহারা !” কণ্ঠাগত প্রাণ ।

কহে হরিদাস—“আর কেন বল ?
মদ্য পেয়ে গেলোঁ দিতে কৃষ্ণনাম !”
“তোমার প্রভুর নাহি কোন দোষ !
শুধু দোষ মম !”—কহিলা নিতাই,
“সৃষ্টিছাড়া আজ্ঞা করিলা—সকলে
দেও কৃষ্ণনাম ভাল মন্দ নাই ।”
প্রভুর আলয়ে আসি হরিদাস
কহেন অষ্টদ্বৈতে সব সমাচার—
“চঞ্চলের সঙ্গে পাঠান আমাকে
প্রভু নিত্য, আমি যাইব না আর ।
আমি যাই কোথা, সে বা যায় কোথা !
পড়ে ঝাপ দিয়া দেখিলে গঙ্গায় ;
ছোটে ধরিবারে ভীষণ কুমীর,
তীরে থাকি আমি কবি হায় ! হায় !
শিশু দেখে যদি কোন্দল করিয়া
যায় মারিবারে ; পিতামাতা তার
আসে ঠেকা হাতে, পায়ে পড়ি আমি
চাহি তাহাদের কাছে পরিহার ।
গোয়ালার দধি ছুঁক লয়ে ধায়,
তাহারা আমাকে মারিতে আসে ;

কুমারী দেখিলে, বলে বিয়া কর,
দেয় গালি তারা পাগল হাসে ।
মানুষ দেখিলে কাঁধে উঠে তার,
ষাঁড়ে চড়ি কহে—‘মহেশ আমি !’
মানা যদি করি, গালি দিয়া কহে—
‘কে রে তোর প্রভু, আমি নাহি মানি ।’
আজি দুই গিয়া মাতালের কাছে
কহে—‘ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণ নাম ।’
মহা ক্রোধে তারা ধায় মারিবারে
কৃষ্ণ কৃপা করি রাখিলেন প্রাণ ।’
হাসিয়া অদ্বৈত কহেন—“দেখিবে
আনি সেই দুই মাতালেরে কাল
আমাদের জাতি ধর্ম নষ্ট করি,
মাতাবে এ দেশ এ তিন মাতাল ।”
শুনি উপহাস হাসেন নিমাই,
দেখি নিত্যানন্দ, ক্রোধে মুখ ভার,
কহে—“খণ্ড খণ্ড কর যদি দেহ,
আমি নাম ভিক্ষা করিব না আর ।
করি রুদ্ধদ্বার কর ঠাকুরালি,
নবদ্বীপে নিন্দা ধরে না আর ।

যেইখানে যাই খাই শুধু গালি,
 লাঠি নিয়ে লোকে আসে মারিবার ।
 বাপ কি মাতাল ! নারকী ভীষণ !
 তাড়াইল আজি কহি—‘মার ! মার !’
 স্থলাঙ্গ অচল হরিদাসে নিয়ে
 গিয়েছিল আজি জীবন আমার ।
 কে চাহে করিতে সাধুর উদ্ধার ?
 করিতে পবিত্র জাহ্নবীর জল ?
 সূর্য্যে দিতে তাপ ? স্নান করে স্নান ?
 কে চাহে করিতে তুষার শীতল ?
 পার য দ, কর পাপীর উদ্ধার,—
 মহাপাপী দুই জগাই মাখাই ।
 হবে নাম তব পতি রূপাবন,
 এমন মধুর নাম আর নাই ।”
 হাসিয়া ঈষদ কহিলেন প্রভু—
 “তুমি তাহাদের চিন্তিছ কুশল
 শ্রীপাদ !—যখন, জানিও নিশ্চয়
 করিবেন কৃষ্ণ তাহাদের মঙ্গল ।”
 আসিয়া শ্রীবাস বিষন্নবদন
 কহিলা—“আসন্ন বিপদ বিষম ।

সমস্ত পণ্ডিত করিয়া মন্ত্রণা

করেছে নালিশ কাজির সদন ।

ক্রোধে কাজি আসি খোল করতাল

ভাঙ্গিল যাহার পাইল যথায়,

ধরিছে মারিছে যারে পায় যথা

সর্ব নবদ্বীপ করে হায় ! হায় !

কহে পণ্ডিতেরা—“নিক হরিনাম

মনে মনে ; ছড়াছড়ি ধর্ম নয় ।

বেদ লজ্যনের উচিত এ দণ্ড ;

নাহি ইহাদেঃ জাতি-নাশ ভয় ।”

রহি মৌনভাবে করোগরে শির,

কহিলেন প্রভু হাসিয়া তখন—

“দেও এ ঘোষণা, কালি অপরাহ্নে

হবে নবদ্বীপে নগরকীর্তন ।”





দশম সর্গ ।

পতিতোদ্ধার ।

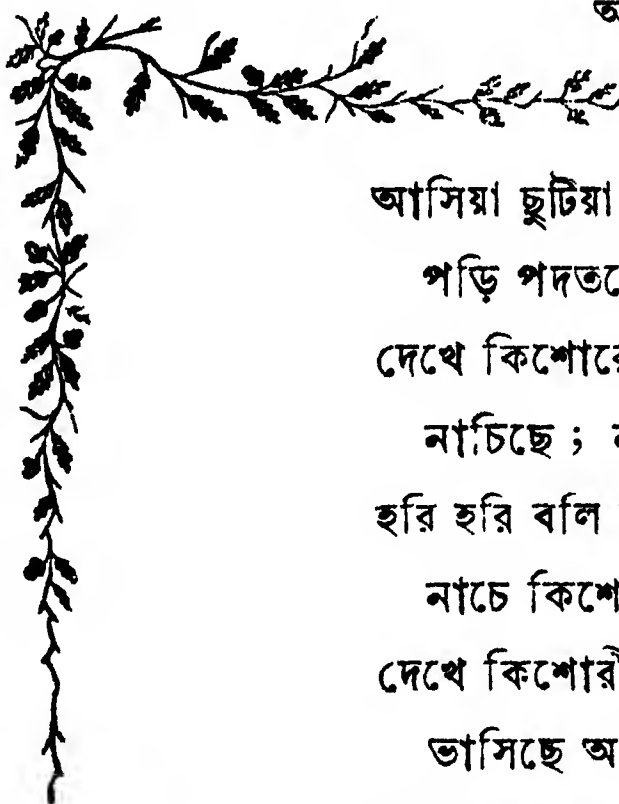
সেই অপরাহ্নে উঠিল বাজিয়া,
শত শত খোল, শত করতাল ।
শত শত শব্দ, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাসা ;
ছেয়ে অপরাহ্ন রবি-কর-জাল
উড়িল আকাশে পতাকা নিশান
শত শত দণ্ডে বিচিত্র বরণ ;
লোকারণ্য শচী মাতার ছয়াରେ ;
হরিধ্বনি পূর্ণ হইল গগণ ।
ছুটিল কীর্তন-স্রোত রাজপথে
লীলা দ্বিতরঙ্গে সম্প্রদায়ে তিন ;

আগে নাচে গায় আচার্য্য স্বদল
আনন্দে অবশ, প্রেমে বাহুহীন ।
মধ্যে হরিদাস অতি দীনহীন
নাচিয়া গাইয়া প্রেমানন্দে ভাসি ;
পরে শ্রীনিবাস গাইয়া নাচিয়া
কৃষ্ণ প্রেমাৰিষ্ট আনন্দ রাশি ।
সৰ্বশেষে প্রেমে পূৰ্ণ আত্মহারা
কণকবিগ্রহ প্রভু জ্যোতিৰ্ময়,
টাচর চিকুরে মালতীর মালা,
ললাটে চন্দন ফাগু বিন্দুচয় ।
আকৰ্ণ বিশ্রান্ত জয়ুগ সুন্দর
আকৰ্ণ বিশ্রান্ত আয়ত নয়ন ;
উৰ্দ্ধ নেত্রতারা নীলমণিময়,
উন্নত নাসিকা সুচন্দ্র আনন ।
চন্দ্রকলাধরে হাসি জ্যোৎস্নার,
ছলিছে সুকর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল ;
দীৰ্ঘ সিংহগ্রীবা, অংশ সমুন্নত,
সুপীন হৃদয় গগণ উজ্জল !
গুরু যজ্ঞমূত্র শোভে অতি ক্ষীণ,
সহ মালতীর মালা মনোহর ;

কাঞ্চন শৃঙ্গাঙ্গে ধারা তুষারের
 শোভিতেছে যেন পবিত্র সুন্দর !
 সুবর্ণ বল্লরী সুবাহু প্রকোষ্ঠে
 মালতীর মালা শোভে কি সুন্দর !
 ক্ষীণ কটিকটে শোভে কৃষ্ণ চেলী,
 কাঞ্চণ শৃঙ্গাঙ্গে ঘন জলধর ।
 চন্দনে চর্চিত সর্ব কলেবর,
 চন্দনে চর্চিত তুলি বাহুদ্বয়,
 নাচিছেন প্রভু হরি হরি বলি,
 দুই পদ্য নেত্রে প্রেমধারা বয় ।
 পুলকে সুবর্ণ কদম্বে পুষ্পিত
 দীর্ঘ দেব দেহ লীলায় মধুর ;
 ভকতের বাঞ্ছা চরণ কমলে
 বাজিছে লীলায় মধুর নুপুর !
 মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল
 বাজিছে গভীরে জলধর শ্বন ;
 বাজে রাম সিঙ্গা রহিয়া রহিয়া
 গভীর নিশ্বনে পুরিয়া গগণ ।
 গাইছে বেড়িয়া প্রেমেতে বিহ্বল
 মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দ রামাই ।

উদ্ধাবিষ্ট নেত্র, দুই বাহু তুলি
‘বোল বোল’ বলি নাচিছে নিমাই ।
দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ গদাধর,
পড়িতে আবেশে রাখিছেন ধরি,
কখনও ভূতলে পড়িয়া আবেশে
সোণার পুতুল যায় গড়াগড়ি ।
সকাদি কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ ঘট,
নারিকেল, আশ্র পল্লব আর,
দধি দুর্বা খাত্ত স্বতের প্রদীপ
গৃহ দ্বারে দ্বারে শোভে নদীয়ার ।
সর্বপের স্থান নাহি রাজপথে,
প্রাকনে প্রাচীরে গবাক্ষে কাহার,
নাহি ছাদে ছাদে নাহি বৃক্ষে স্থান,
বৃক্ষে বৃক্ষে নর পত্র পুষ্প ভার ।
যার আছে খোল, আছে করতাল
আসিছে লইয়া আনন্দে বিহ্বল,
গায় হরিনাম দশবিংশ মিলি,
নাচে শতশত কীর্তনের দল ।
শত শত কণ্ঠে রহিয়া রহিয়া
উঠে হরিশ্রবণি পবিত্র গঞ্জীর,

রহিয়া রহিয়া উঠে ছলুধ্বনি,
সহস্র সহস্র কণ্ঠে রমণীর ।
বাজে গৃহে গৃহে শঙ্খ শত শত,
শত শত ঘণ্টা কাংস্থ অগণন,
মঙ্গল উৎসবে উন্মত্ত নগর
করে থই কড়ি পুষ্প বরিষণ ।
উর্ধ্বনেত্র তারা, দুই বাহু তুলি,
নাচিছেন প্রভু আনন্দে বিহ্বল
বাহি পদ্মনেত্র সুরবর্ণ কপোল,
বহে সুরধুনী ধারা অবিরল ।
'হরি বোল' কথা নাহি আসে মুখে,
কহিছেন প্রভু শুধু 'বোল ! বোল',
'হরি বোল হরি !'—কহে নরনারী,
কহে শিশুগণ—'হরি হরি বোল !'
হাসিছেন কভু কি জ্যোৎস্না হাসি,
জুড়ায়ে তাপিত নরনারী প্রাণ ;
করিছেন কভু করুণ রোদন,
দ্রবি করুণায় কঠিন পাষাণ ।
মগরে নগরে যেখানে যখন
বাইছেন প্রভু, গৃহ পরিহরি



আসিয়া ছুটিয়া দেখি অশ্রু হাসি,
 পড়ি পদতলে দেয় গড়াগড়ি ।
 দেখে কিশোরেরা ব্রজের গোপাল
 নাচিছে ; নাচিছে চুড়া পীতধড়া ;
 হরি হরি বলি দিয়া করতালি,
 নাচে কিশোরেরা আনন্দে ভরা ।
 দেখে কিশোরীরা ব্রজের কিশোরে
 ভাসিছে অধরে কি সুখা হাসি !
 হরি হরি বলি নাচে আত্মহারা,
 শুনিয়া শ্রবণে মধুর বাঁশি ।
 দেখে প্রোঢ় প্রোঢ়া নন্দের ছলল,
 দেখে যশোদার কানাই বলাই ;
 নাচিছে কি প্রেমে গলাগলি করি,
 কি প্রেমে বিভোর নিমাই নিতাই ।
 “আয় বাছ আয় ! আয় বুকে আয় !”—
 কাঁদি লয় বুকে পাগল পারা ।
 “মা !—মা !—মা ! বাপ ! বাপ ! বাপ !”—
 কাঁদে দুই ভাই প্রেমে আত্মহারা ।
 দেখে পিতা প্রভু অতুল নর নারী,
 বাপ ! প্রভু !—বলি চরণে পড়ি,

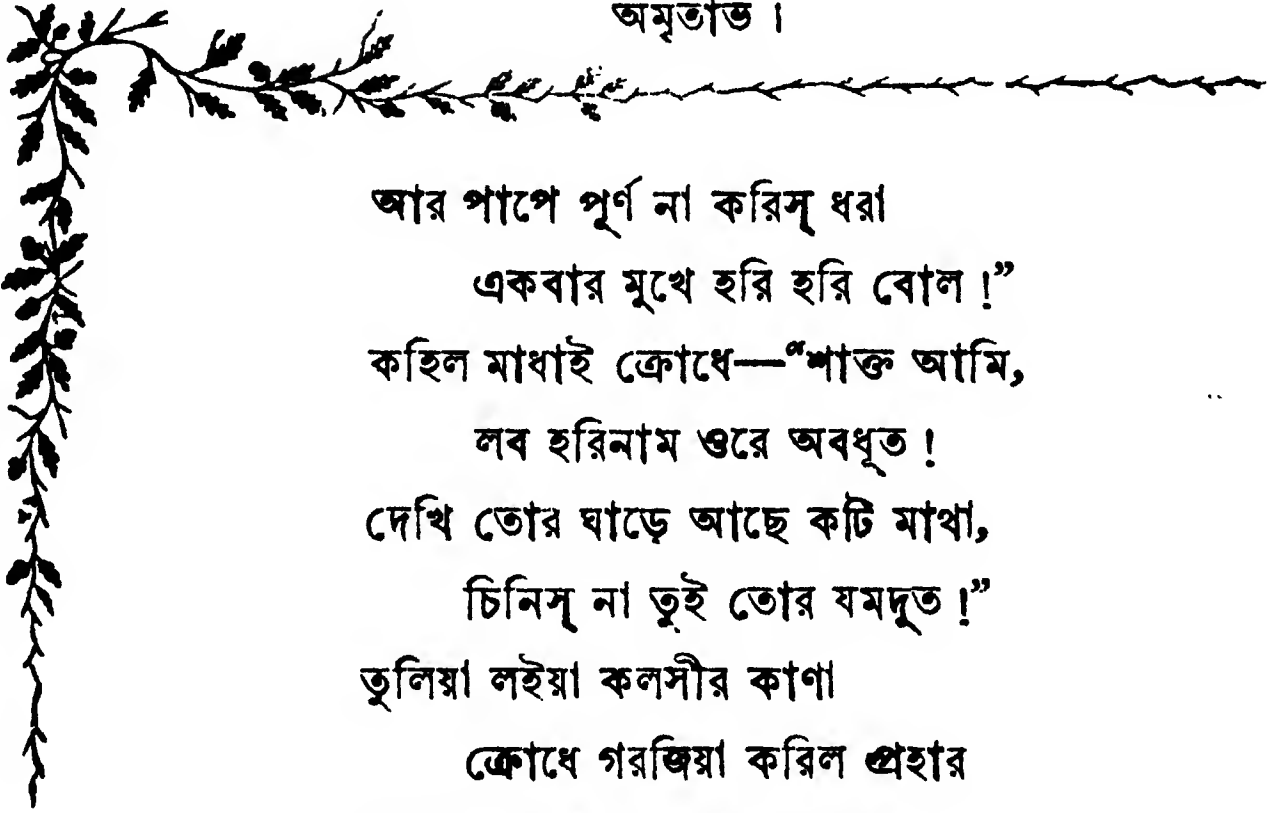
ভুলি পতি পত্নী কোলের সন্তান,
 ধূলার আকুল দেয় গড়াগড়ি ।
 যেখানে যেকূপে ভক্ত করে ধ্যান,
 দেখে সেইরূপে প্রভু বিদ্যমান ;
 কেহ দেখে বিষ্ণু, কেহ দেখে শিব,
 কেহ দেখে কৃষ্ণ, কেহ দেখে রাম ।
 নগর নগর করিয়া উদ্ধার
 গেলা প্রভু গঙ্গাঘাটে আপনার,
 চলিল কীর্তন-শ্রোত তীরে তীরে
 জগাই মাধাই ঘাটে এই বার !
 নিজ গৃহ দ্বারে দাঁড়ায়ে হুতাই
 দেখে সবিস্ময় নদীয়া নগর
 আসিছে ভাঙ্গিয়া কি অনন্ত শ্রোতে,
 অনন্ত তরঙ্গে, বিস্ময়কর ।
 বাজিছে মৃদঙ্গ বাজিছে মন্দিরা,
 বাজে করতাল শত সংখ্যাতীত,
 বাজে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসা, রামশিঙ্গা,
 গোধূলি আকাশ করিয়া প্লাবিত ।
 শত শত দল, শত শত কণ্ঠে
 করিছে কীর্তন তুলিয়া ঝঙ্কার,

হেলিয়া ছলিয়া, নাচিয়া, ঘুরিয়া,
উঠিয়া পড়িয়া করিয়া ছফ্ফার ।
উঠিছে তরঙ্গে গোধূলি আকাশে
অনন্ত কণ্ঠেতে 'হরিবোল হরি !'
উঠিছে অনন্ত কণ্ঠে হলুধ্বনি
লহরে লহরে কি লীলা করি !
শত শত কর ফুল, খই, কড়ি,
বরিষা ধারায় করিছে বর্ষণ ;
বরিষা ধারায় নেত্রে সংখ্যাতীত
বহিছে ভক্তির আনন্দ প্লাবন ।
নাহি জ্ঞান কেবা কার গায়ে পড়ে,
কে কাহারে ধরে শিশুর মতন ;
কে লইছে কার চরণের ধূলি,
কার গলা ধরি কে করে ক্রন্দন ।
কেহ নাচে, কেহ গায়, বলে হরি,
কেহ বা ধূলায় দেয় গড়াগড়ি,
কেহ নানা বাদ্য বাজাইছে সুখে,
কেহ বা মূর্ছিত রহে পথে পড়ি ।
নাচে নর নারী, গায় নর নারী,
দিয়া করতালি বলি 'হরি ! হরি !'

দিয়া করতালি নাচে গায় কেহ
বৃক্ষ হ'তে লক্ষ্যে ভূতলে পড়ি ।
ভাঙ্গি বৃক্ষ ডাল কহে গর্জি কেহ
পাষণ্ড পণ্ডিত করিব দলন ;
কিলাইয়া মাটি কেহ কহে ক্রোধে
বধিব পণ্ডিত পাষণ্ড এখন ।
“বটে ! বটে ! বেটা !”—কহে পণ্ডিতেরা—
“যত বড় মুখ কথা তত বড় ।”
দলে দলে ভয়ে দাঁড়াইয়া দূরে
কহে পণ্ডিতেরা কাঁপি থর থর ।
“আসিছেন কাজি লয়ে সৈন্য দল,
ওরে কুস্মাণ্ডেরা ! দেখিব এখন,
কেমনে গইয়া খোল করতাল,
ঢাল তরবার সঙ্গে করিসু রণ ।”
কেহ গিয়া পড়ে প্রভু পদতলে,
কেহ বা পড়িতে ধরে অগ্ন্যজ্ঞান
কহে টিকি নাড়ি,—“কি কর ! কি কর !
হিন্দু ধর্মটাকে দিবে বিসর্জন !”
কেহ দিয়া বাপ পড়িছে গঙ্গায়,
কেহ ভয়ে বেগে করে পলায়ন ;

কেহ পিণ্ডবৎ যাইতে হতেছে
কুস্তোদর সহ ভূতলে পতন ।
জগাই মাধাই কাছে গিয়া কেহ
কহে—“শুন বাপু! তোমরা দুভাই
পরম তান্ত্রিক, এই নবদ্বীপে
তোমাদের মত পুণ্যবান্ নাই !
আজি হিন্দুধর্ম, শাক্তধর্ম সহ,
নিমাই পণ্ডিত দিল রসাতল ;
আজি রক্ষা কর তোমরা দুভাই,
হিন্দুধর্ম সহ পণ্ডিত সকল ।”
দল পরে দল গেল চলি ক্রমে ;
গেল চলি তুলি প্রেমের প্লাবন
আচার্য্যের দল, হরিদাস দল,
শ্রীবাসের দল করিয়া কীর্ত্তন ।
কহিল জগাই—“দেখরে মাধাই !
বাজে চারিদিকে খোল করতাল,
মাঝে ও কে নাচে সোণার মুরতি ?
ঝলসিছে অঙ্গে কি কিরণজাল !
এত নহে ভাই ! মানুষের রূপ ;
এত অঙ্গ-জ্যোতিঃ মানুষের নহে ;

মানুষের নেত্রে মুক্ত অবিরল,
ছই নদী ধারা একপে কি বহে ?
দেখ নর নারী করি কোলাকুলি,
কাঁদিয়া আকুল চরণে পড়ি ;
সোণার পুতুল কি ভাবে বিভোর
ধুলায় পড়িয়া দেয় গড়াগড়ি ।
অধরে কি হাসি ! নেত্রে কি ককণা !
দেখ কি চাহনি চাহিছে আমায় !
মদের উপরে ঢালি মাদকতা,
জুড়াইল প্রাণ অমৃত ধারায় !”
সংকীৰ্ত্তন দল, নিত্যানন্দ আগে,
নাচিয়া গাইয়া আসিলে কাছে,
ছুটিয়া মাধাই আগুলিল পথ ;
হরি ! হরি ! বলি নিতাই নাচে ।
মদিরা জড়িত কণ্ঠেতে মাধাই
কহে—“বেড়ে গাও, বেড়ে নাচ আর ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আজি সবে
গাইবে নাচিয়া গৃহেতে আমার ।”
প্রেমেতে বিহ্বল কহিল নিমাই—
“ভাইরে মাধাই ! আয় দিব কোল !



আর পাপে পূর্ণ না করিসু ধরা

একবার মুখে হরি হরি বোল !”

কহিল মাধাই ক্রোধে—“শাক্ত আমি,

লব হরিনাম ওরে অবধূত !

দেখি তোর ঘাড়ে আছে কটি মাথা,

চিনিসু না তুই তোর যমদূত !”

তুলিয়া লইয়া কলসীর কাণা

ক্রোধে গরজিয়া করিল প্রহার

নিত্যানন্দ শিরে ; যেন রক্তগঙ্গা

ছুটিল পবিত্র শোণিত ধারার ।

কলসীর কাণা হানিতে আবার,

বেগে দৃঢ় করে ধরিয়া জগাই

কহিল উচ্ছ্বাসে—“কি কর ! কি কর !

বিদেশী সন্ন্যাসী কেন মার ভাই !”

খামিল কীর্তন ; মহা হাহাকার

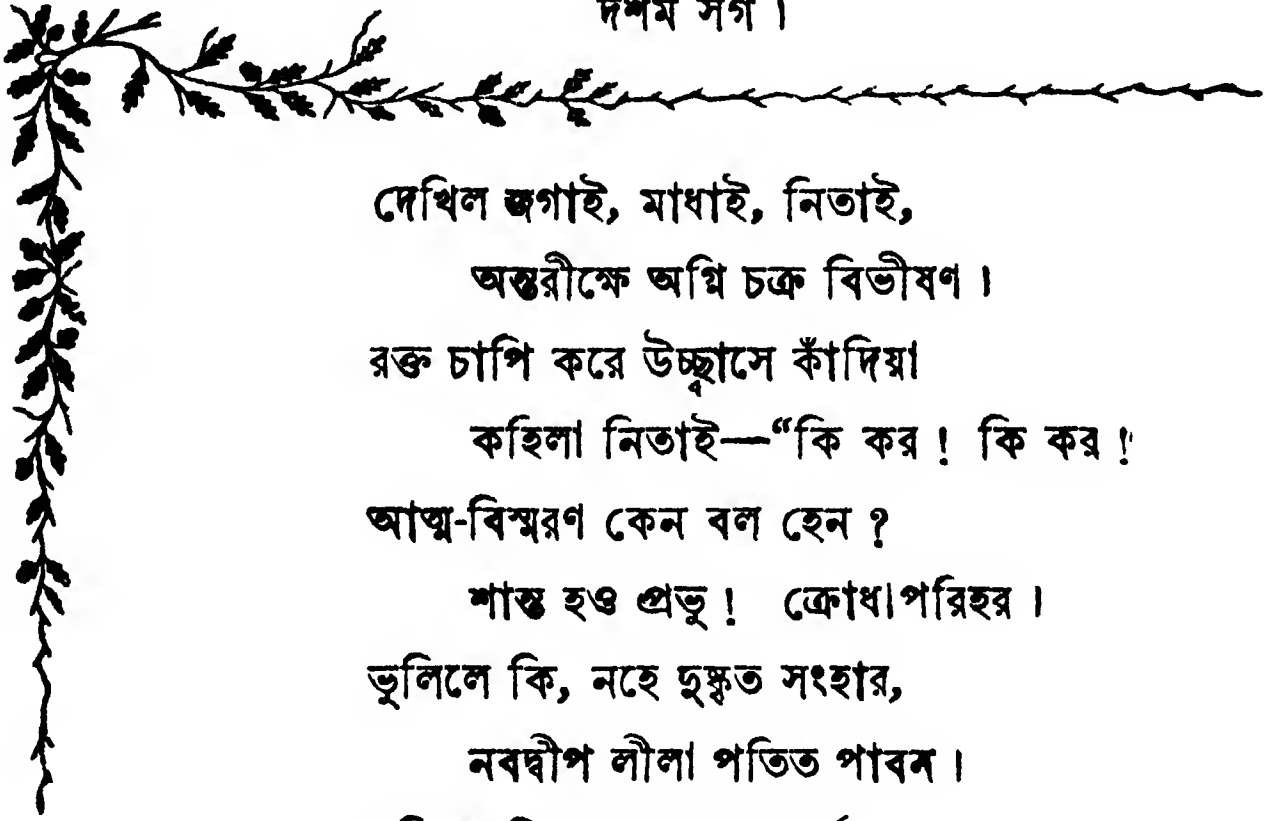
উঠিল তখন ; বিস্ময়ে চাহি ?

দেখিলেন প্রভু হাসিছে নিতাই,

ঝরিছে শোণিত ললাট বাহি ।

কৃষ্ণভাবাবেশে আবিষ্ট বিভোর

“চক্র ! চক্র !” ক্রোধে গর্জিল তখন,



দেখিল জগাই, মাধাই, নিতাই,

অন্তরীক্ষে অগ্নি চক্র বিভীষণ ।

রক্ত চাপি করে উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া

কহিলা নিতাই—“কি কর ! কি কর !

আত্ম-বিস্মরণ কেন বল হেন ?

শাস্ত হও প্রভু ! কোথা পরিহর ।

ভুলিলে কি, নহে দুষ্কৃত সংহার,

নবদ্বীপ লীলা পতিত পাবন ।

ভুলিলে কি, নহে চক্র স্মদর্শন,

নবদ্বীপ লীলা-চক্র সঙ্কীৰ্ত্তন ।

বিশেষ জগাই মারে নি আমায় ;

মাধাই মারিতে রাখিল জগাই ।

দৈবে রক্ত পড়ে, হুঃখ নাহি পাই,

ভিক্ষা দেও প্রভু ! এই দুই ভাই !”

জগাইরে প্রভু ! করি আলিঙ্গন

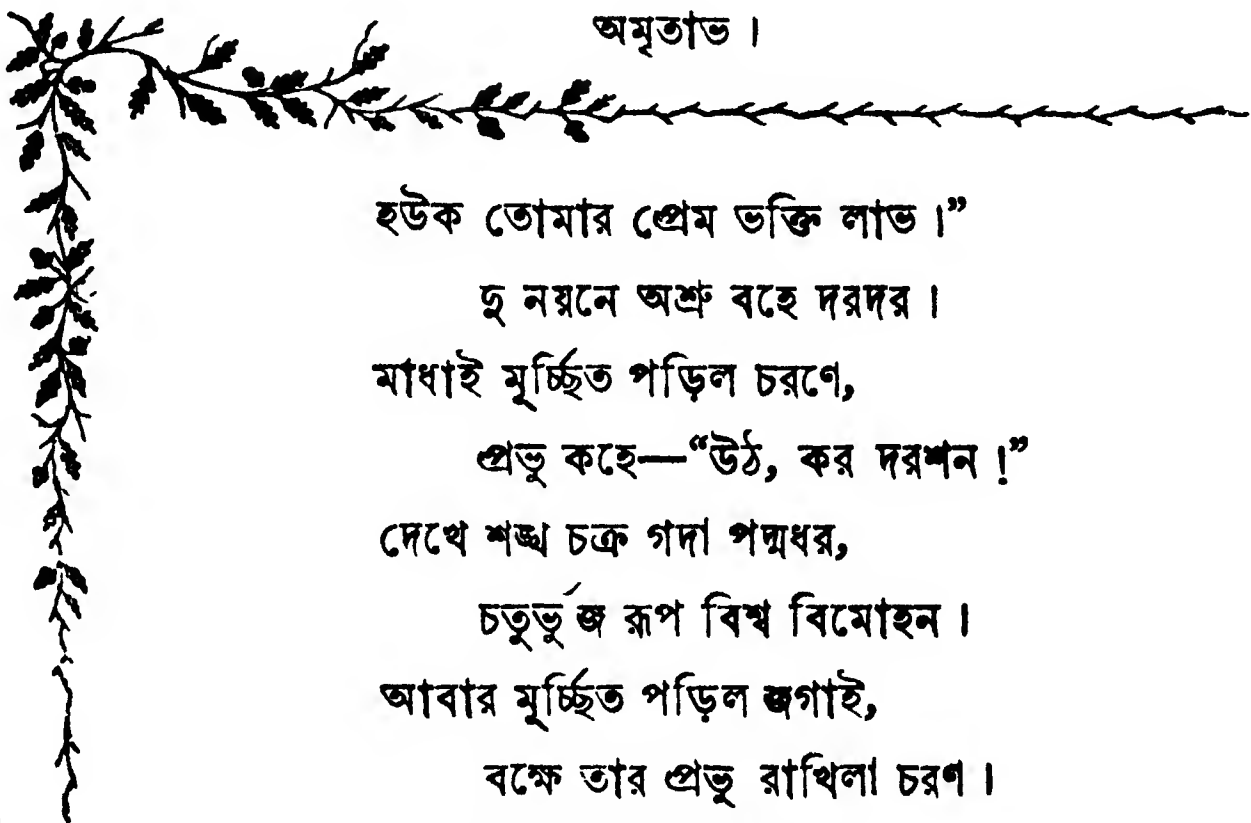
কহিলা কাঁদিয়া—“জগাই ! জগাই !

আজি তুই ভাই কিনিলি আমারে,

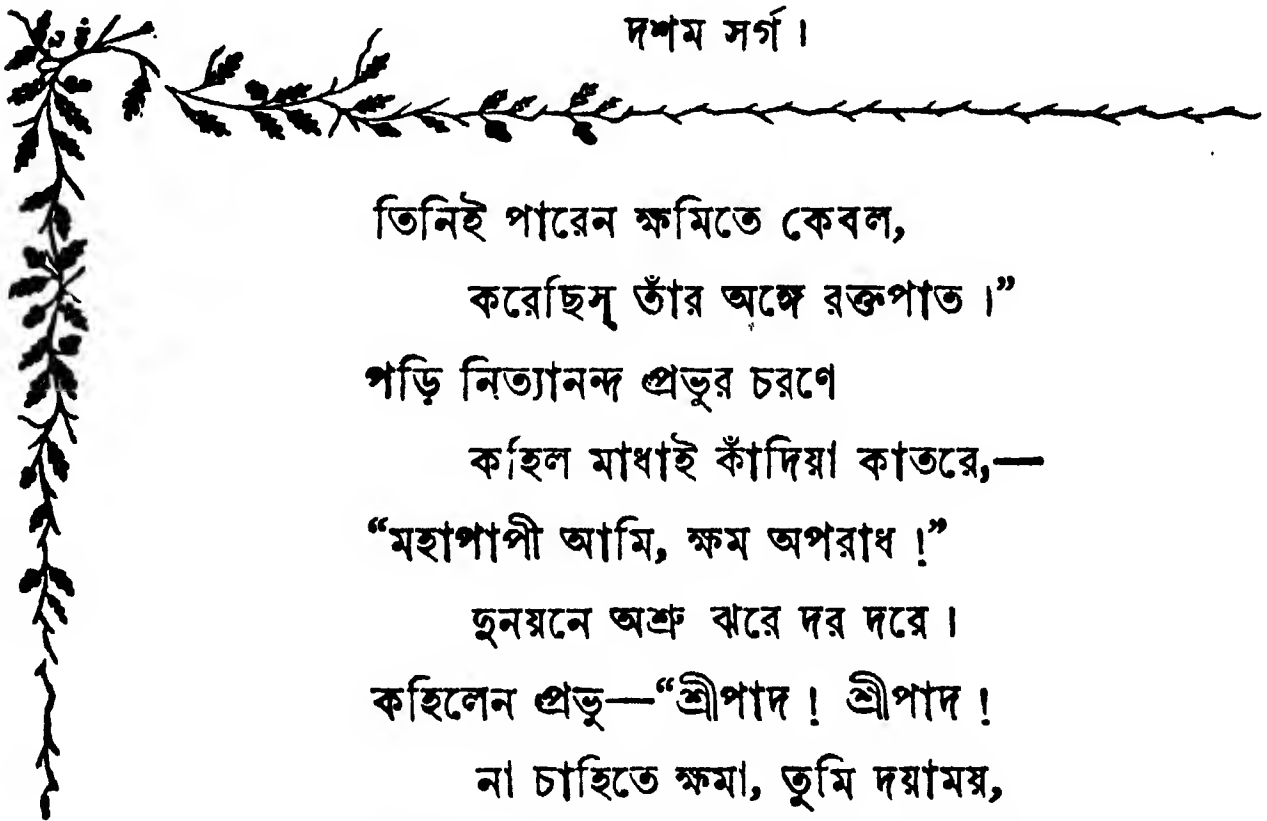
রাখি নিত্যানন্দে প্রাণ সম ভাই ।

আজি কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে

যে অভীষ্ট তব চাহ সেই বর,



হউক তোমার প্রেম ভক্তি লাভ ।
 তু নয়নে অশ্রু বহে দরদর ।
 মাধাই মুচ্ছিত পড়িল চরণে,
 প্রভু কহে—“উঠ, কর দরশন !”
 দেখে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর,
 চতুর্ভুজ রূপ বিশ্ব বিমোহন ।
 আবার মুচ্ছিত পড়িল জগাই,
 বক্ষে তার প্রভু রাখিলা চরণ ।
 নর নারী কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি
 উঠে হরিধ্বনি বিদারি গগন ।
 মাধাইর প্রাণে ধীরে ধীরে ধীরে
 করি মদিরার মাদকতা দূর
 কি যেন অমৃত হইল সঞ্চার,
 পড়িল কাঁদিয়া চরণে প্রভুর ।
 কহে—“হুইজন করিলাম পাপ ;
 কেন তব কৃপা কর হুই ভাগ ?
 দেও এ পাপীকে দেও তব নাম,
 দেও প্রেম ভক্তি পুণো অনুরাগ ।”
 প্রভু কহে—“তোর নাই পরিজ্ঞান,
 নিত্যানন্দ অঙ্গে করিলি আঘাত ।



তিনিই পারেন ক্ষমিতে কেবল,
 করেছিম্ তাঁর অঙ্গে রক্তপাত ।”
 পড়ি নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে
 কহিল মাধাই কাঁদিয়া কাতরে,—
 “মহাপাপী আমি, ক্ষম অপরাধ !”
 ছনয়নে অশ্রু ঝরে দর দরে ।
 কহিলেন প্রভু—“শ্রীপাদ ! শ্রীপাদ !
 না চাহিতে ক্ষমা, তুমি দয়াময়,
 ক্ষমিয়াছ আগে, জানি প্রভু ! আমি ;
 কিন্তু হেন পাপী ক্ষমা-যোগ্য নয় ।
 আমি করষোড়ে এ পাপীর তরে
 চাহিতেছি ক্ষমা চরণে তোমার ।
 কাঁদিছে মাধাই পড়িয়া চরণে
 ক্ষমা করি কর পাতকী উদ্ধার ।”
 করুণার সিন্ধু প্রভু নিত্যানন্দ
 কহিলা কাঁদিয়া—“একি লীলা ভাই !
 তুমিই করিবে পতিত উদ্ধার,
 আমি পাষণের সেই শক্তি নাই ।
 থাকে কোনো জন্মে স্মৃতি আমার,
 মাধাইকে আমি দিলাম সকল ;

ছাড় মায়া প্রভু ! তোমার মাধাই,
 তুমি কৃপা কর, করুণ-কোমল ।”
 আয়রে মাধাই ! বল হরিবোল !
 আয় ভাই আয় ! আয় কোলে আয় !
 মেরেছিন্ তুই কলসীর কাণা,
 তা বলে কি প্রেম দিব না রে আয় !
 তুলি মাধাইকে লইলেন বুকে,
 মূৰ্চ্ছিত চরণে পড়িল মাধাই ।
 লক্ষ নর নারী—হরিবোল হরি !—
 গাইল, কাহারো শুষ্ক নেত্র নাই ।
 উঠিল বাজিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা,
 উঠিল বাজিয়া করতাল আর ;
 বেড়ি ছই প্রভু—চরণে ছুতাই—
 উঠিল কীর্তন কিবা করুণার ।

—○—

কীর্তন ।

“আয় রে জগাই মাধাই আয় !
 সঙ্কীৰ্তনে নাচ'বি যদি আয় !

ওরে মেরেছিস কলসীর কাণা,
 তা বলে কি প্রেম দিব না, আয় !
 রক্তে অঙ্গ ভেসে যায় রে !
 রক্তে অঙ্গ ভেসে যায় ।
 মার খেয়েছি আরো খাব,
 আয় কোলে প্রেম দিব রে আয় !
 স্নান করায় গঙ্গার জলে,
 হরি নামের মালা দিব আয় !”
 আইল গোধূলি নিদাঘ আকাশে,
 আবরিয়া ধরা গান্ধীর্ষা ছায়ায় ;
 নাচি ছুই ভাই দিয়া করতালি,
 হরি ! হরি ! বলি পড়িল গঙ্গায় ।
 হইল জগাই মাধাই উদ্ধার—
 বহি এই বার্তা বেগে ঝটিকার,
 সর্ব নবদ্বীপ আসিয়া ছুটিয়া
 দেখিছে স্তম্ভিত চিত্রিত আকার—
 স্নাত ছুই ভাই জগাই মাধাই
 দাঁড়ায় আবক্ষ সলিলে গঙ্গার ;
 তাঁমা ও তুলসী কৃতাজলিপুটে,
 হুনয়নে অশ্রুধারা অনিবার ।

বসি স্নাত তীরে পদ্মাসনে স্থির,
প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর ;
স্নাত ভক্তগণ দাঁড়াইয়া স্থির
চিত্তার্পিত, নেত্রে অশ্রু দরদর ।
নিদাঘ গোধূলি নীরব গস্তীর ;
গস্তীর নীরব জাহুবী জল ;
নীরব গস্তীর লোকারণ্য তীরে,
নীরব গস্তীর শূন্য ধরাতল ।
নীরবতা বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
প্রভুর শ্রীকণ্ঠ করুণ গস্তীর,
কহিলেন প্রভু অঞ্জলি পাতিয়া,
পুলকে পুষ্পিত পবিত্র শরীর—
“দেও জগন্নাথ ! মাধব ! আমায়
তামা ও তুলসী সহ গঙ্গাজল,
দেও, তোমাদের পাপ কর দান,
হও দুই ভাই পবিত্র নিম্নল !
দেখিছে জগাই, দেখিছে মাধাই,
সম্মুখে কি মূর্তি পতিত পাবন !
অঙ্গে কিবা জ্যোতি ! কি দেব মহিমা !
কিবা চতুভূজ মূর্তি নারায়ণ !

ধীরে ধীরে ধীরে গোধূলি আকাশে
ফুটিছে নক্ষত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জল ;
পাপীর হৃদয়ে সঞ্চারি গোধূলি
ফুটিছে পুণ্যের নক্ষত্র নিশ্চল ।
কহিছে কাঁদিয়া জগাই মাধাই,—
“একি কথা শ্রু ! জগত তোমার
করে পূজা দিয়া কুসুম চন্দন,
দিয়া বহুমূল্য রত্ন উপহার ।
মহাপাপী শ্রু ! আমরা দুভাই,
কত নর-হত্যা, নারী-হত্যা আর
করিয়াছি হায় ! কেমনে অর্পিব
আমাদের পাপ শ্রীকরে তোমার ।
না, না, পারিব না ; আমরা দুজন
মহাপাপী, কর দণ্ড সমুচিত ।
ডাক চক্রে তব, করি খণ্ড খণ্ড
কর এই দেহ নরকে পতিত ।”
নীরবতা বক্ষে আবার, আবার
উঠিছে শ্রুতুর কণ্ঠ সুমঙ্গল—
“তোমাদের পাপ ভিক্ষা চাহি আমি ;
দেও দান, হও পবিত্র নিশ্চল !”

কহিলা নিতাই অশ্রুপূর্ণ মুখ,
কেন জগন্নাথ ! মাধব ! এমন
হইতেছ ভ্রান্ত, জাননা কি হরি
পাপী ত্রাণকারী পতিত পাবন ?
নীরব জগত্ শূন্য ধরাতল,
ফুটিছে আকাশে নক্ষত্র নীরব ;
কহিলেন প্রভু অঞ্জলি পাতিয়া—
“আমাকে দুভাই দেও পাপ সব ।”
কাঁদি উচ্চ কণ্ঠে জগাই মাধাই
পড়ি দান মন্ত্র পবিত্র মধুর,
মহাপাপী দুই মহাপাপ রাশি
করিল উৎসর্গ শ্রীকরে প্রভুর ।
দেখে সিক্ত নেত্রে লক্ষ নর নারী
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চিত্রিত আকার,—
পূর্ণ চন্দ্র অঙ্গে রাহু ছায়া মত,
হলো গৌর বর্ণে কালিমা সঞ্চার ।
উঠিল প্লাবিয়া সায়াহু গগন
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে—হরিবোল হরি !
পড়িতে গজায় জগাই মাধাই
মুচ্ছিত, রাখিলা ভক্তগণ ধরি ।

আবার বাজিয়া উঠিল মৃদঙ্গ,
বাজিল মন্দিরা শঙ্খ করতাল,
উড়িল আকাশে পতাকা অনন্ত,
জ্বলিল ভূতলে অসংখ্য মশাল ।
চলিল কীর্তন কাজির নগরে,
গঙ্গা তীরে তীরে প্রবাহে গঙ্গার ;
সর্ব নবদ্বীপ ভক্তিতে বিহ্বল
দেখিয়া জগাই মাধাই উদ্ধার ।
সর্ব নবদ্বীপ উন্নত এখন,
নাচে নরনারী নাচে শিশুগণ,
কীর্তনের তালে তালে দিয়া তালি ;
নাচিছে অসংখ্য মশাল কেতন ।
কহিলেন কাজি ডাকিয়া কিস্বরে—
“দেখ কোলাহল কিসের কারণ ।
বুঝি কারও বিয়া ; ভূত উপাসক
করিতেছে কিম্বা ভূতের কীর্তন ।”
উদ্ধ্বাসে ফিরি প্রথম কিস্বর
কহে—“জাঁহাপনা ! কর পলায়ন ;
কোটা কোটা লোক আসিছে লইয়া
নিমাই পণ্ডিত করিতে রণ ।

লক্ষ লক্ষ খোল, লক্ষ করতাল ;
লক্ষ মহাতাপ মশাল জলে ;
লক্ষ লক্ষ লোকে নাচিছে গাইছে ;
আল্লা ! লক্ষ কণ্ঠে হরি ! হরি ! বলে ।
আজি কাফেরেরা কি করে না জানি,
চল জাঁহাপনা করি পলায়ন ।”
হাসি কহে কাজি—“খোল কাসা নিয়া
আসে কিরে মূর্থ ! করিবারে রণ ?”
দ্বিতীয় কিঙ্কর আসি উর্দ্ধ্বাশ,
কহে—“জাঁহাপনা কি কহিব আর ?
‘কেলা গাছ’ ঘট আমের পল্লব,
ছয়ারে ছয়ারে আজি নদীয়ার ।
পুষ্পময় পথ, খই, খড়ি, ফুল
পড়িতেছে যেন ফৌটা বরিষার ।
বাজে কি বাজনা ; আল্লা ! কি চীৎকার,
নগরে নগরে আজি নদীয়ার ।
কহে কাফেরেরা—‘মার ! কাজি মার !’
করে কি ছঙ্কার নিমাই আচার্য্য ।
নাচে সে কি নাচ, খায় কি আছাড়,
সেই হিন্দুভূত, এ তাহার কার্য্য ।

আজ্ঞা ! এ বামনা এত কাঁদে কেন ?

ছই চোকে যেন নদীপারা বহে ।

বুঝি শচী বুড়ী মরিয়াছে আজি ;

এত জল বান্ধা চোকেতে কি রহে ?”

আসি উদ্ধ্বাসে কহে পণ্ডিতেরা—

“ভো ! ভো ! কাজি ! রক্ষ পণ্ডিত সকল !

ধর্ম তোমাদের, ধর্ম আমাদের,

নিমাই পণ্ডিত দিল রসাতল ।

পথে পথে পথে এই নৃত্য গীত,

এই মাতলামি লাফালাফি আর,

আছে কোন্ ধর্ম ? বউ ঝি কাহার

নাহি আজি গৃহে এই নদীয়ার ।”

কহিল আসিয়া কিঙ্কর তৃতীয়—

“জাঁহাপনা ! আমি কহিব কি আর ?

তুনি নাই কভু মানুষ এমন

হইতে পাগল নামেতে আল্লার ।

দেখ গিয়া লক্ষ লক্ষ নর নারী,

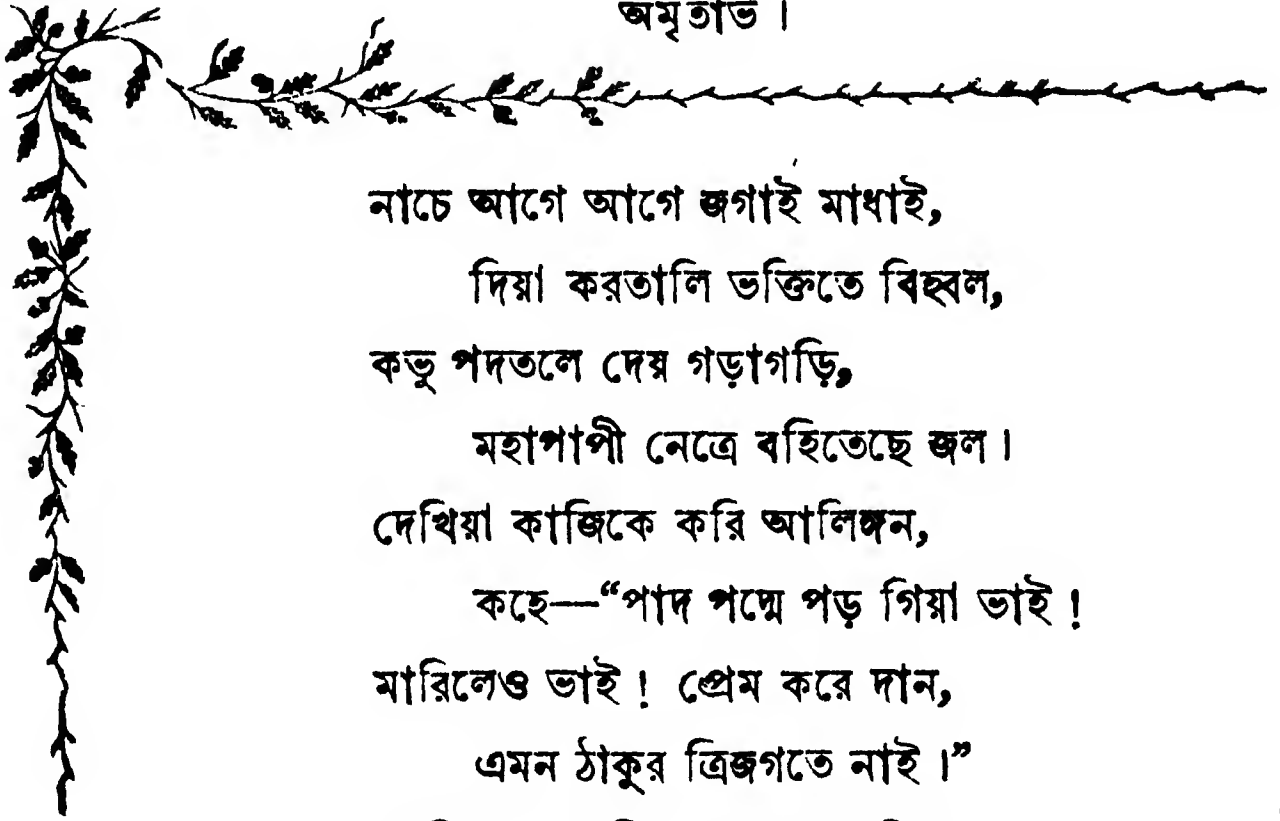
হরি হরি বলি দেয় গড়াগড়ি ;

দেখ গিয়া কত শত নর নারী,

রয়েছে মুচ্ছিত রাজপথে পড়ি ।

শিরে পাগ বান্ধি কত মুসলমান
নাচিছে গাইছে ভক্তিতে বিহ্বল ;
দেখিলে ভক্তিতে গলিবে পাষণ,—
মুচ্ছিত কিস্কর পড়িল ভূতল ।
ছুটিলেন কাজি, দাঁড়াইয়া পথে
দেখিলা কি দৃশ্য, আঁখি ছল ছল !
ষতদূর চক্ষে যাইতেছে দেখা,
লোকারণ্য তীর, জাহুবীর জল ।
বাজিছে মৃদঙ্গ, বাজিছে মন্দিরা,
শত শত শব্দ, কাংশু করতাল,
উঠিছে কীর্ত্তন গ্লাবি নৈশাকাশ,—
“হরে কৃষ্ণ হরে গোবিন্দ গোপাল ।”
ঘন হরিশ্বনি, ঘন হলুদ্বনি,
নাচে নর নারী আনন্দে অধীর ;
নাচে সংখ্যাতীত পতাকা মশাল,
নাচে প্রতিবিশ্ব জলে জাহুবীর ।
ঘারে ঘারে ঘট পল্লবের সনে,
জলিতেছে দীপ, সারি জোনাকীর,
তরুণীর বক্ষে জলে সংখ্যাতীত,
নাচে প্রতিবিশ্ব বক্ষে জাহুবীর ।

নাচে নর নারী তীরে জাহুবীর,
নাচে তরীবক্ষে জাহুবীর নীরে,
উঠে হরিধ্বনি, উঠে হনুধ্বনি,
প্লাবি জলস্থল কীর্তন নির্যরে ।
ক্রমে লোকারণ্য কাজির নগর ;
লোকারণ্য ক্রমে বাড়ী ও প্রাঙ্গণ ;
কেহ তুলি ফুল, কেহ ভাঙ্গি ডাল,
নাচে হরি বলি উন্মাদ যেমন ।
গঙ্গা স্রোত মত সঙ্কীৰ্তন স্রোত,
চলিল বহিয়া কাজির আলায় ;
ও কে নাচে আহা ! ওই দেব রূপ,
ওই নৃত্য গীত মামুষের নয় ।
কখন মুচ্ছিত পড়িছে ধরায়,
কভু মত্ত ভক্ত রাখিছে ধরি ;
দেখিছেন কাজি, কত নর নারী,
চরণে পড়িয়া দেয় গড়াগড়ি ।
নাসিকা বহিয়া ঝরে নেত্রধারা,
স্বর্ণবাহু তুলি বলে—“বোল ! বোল !”
অভিন্ন পতিত হিন্দু মুসলমানে,
উচ্ছে নীচে প্রভু দিতেছেন কোল ।



নাচে আগে আগে জগাই মাধাই,
 দিয়া করতালি ভক্তিতে বিহ্বল,
 কভু পদতলে দেয় গড়াগড়ি,
 মহাপাপী নেত্রে বহিতেছে জল ।
 দেখিয়া কাজিকে করি আলিঙ্গন,
 কহে—“পাদ পদ্মে পড় গিয়া ভাই !
 মারিলেও ভাই ! প্রেম করে দান,
 এমন ঠাকুর ত্রিজগতে নাই ।”
 দেখিছেন কাজি—মহা মরুভূমি *
 নাচে আত্মহারা লক্ষ নারী নর ;
 ও কি মহামূর্তি † ঘোষিছে গম্ভীর—
 “লা এলাহি আলা ! আলা হো আকবর !”
 ইলাহা ইল্লা,—একই ঈশ্বর ;
 আলা হো আকবর,—দয়ার সাগর ;—
 তনিলেন কাজি, পড়িলেন কাজি,
 মুচ্ছিত প্রভুর চরণ উপর ।
 “উঠ ! ভাই ! উঠ ! এস বক্ষে এস ।
 পবিত্র হইল হৃদয় আমার !”

* আরব দেশ । † হজরত মহম্মদ ।

কহিলেন প্রভু বক্ষেতে লইয়া ;
 উভয় মূচ্ছিত,—মূর্ত্তি দেবতার ।
 উঠে হরিশ্বনি, উঠে হনুশ্বনি,
 লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে,—মত্ত নারী নর ।
 গায় মুসলমান, ভক্তিতে বিহ্বল—
 ‘লা এলাহি আলা’—‘আলা হো আকবর ।’

উঠিল আকাশে কৃষ্ণা তৃতীয়ার
 নিদাঘের শশী শান্ত সমুজ্জল ;
 উঠিল পতিত হৃদয় আকাশে
 প্রেম ধর্ম্ম শশী পবিত্র শীতল ।
 দেখিলেন শশী কি মহা মিলন !
 দেখিলেন কিবা মহা আলিঙ্গন !
 আকবরের নীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত,
 ভারতের মহা প্রয়াগ সঙ্গম ।
 এই মহা নীতি, এ মহা মিলন
 বুঝিল না আরজুনের অন্নপ্রাণ !
 হায় মা ! হায় মা ! বুঝিবে কি কভু
 তোরে ছুই পুত্র হিন্দু মুসলমান ? *

* “মাধাই ব্রহ্মচারী-ব্রত লইলেন ও প্রত্যহ ছুই লক্ষ হরিনাম লইতেন ।

তিনি গঙ্গাতীরে স্বহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন । তাহাকে লোক মাধাইয়ের ঘাট বলিত । এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে । মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন । তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গভক্ত ।”

—অমিয় নিমাই চরিত ।

“কাজির কবর অদ্যাপি বিরাজিত । সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন ।”

—অমিয় নিমাই চরিত ।

“প্রভুর আজ্ঞায় মাধাই ঘাট বান্দিল ।

পাপহরণ ঘাট তার নাম খুইল ॥”

—জগদানন্দের ‘চৈতন্য-মঙ্গল’ ।

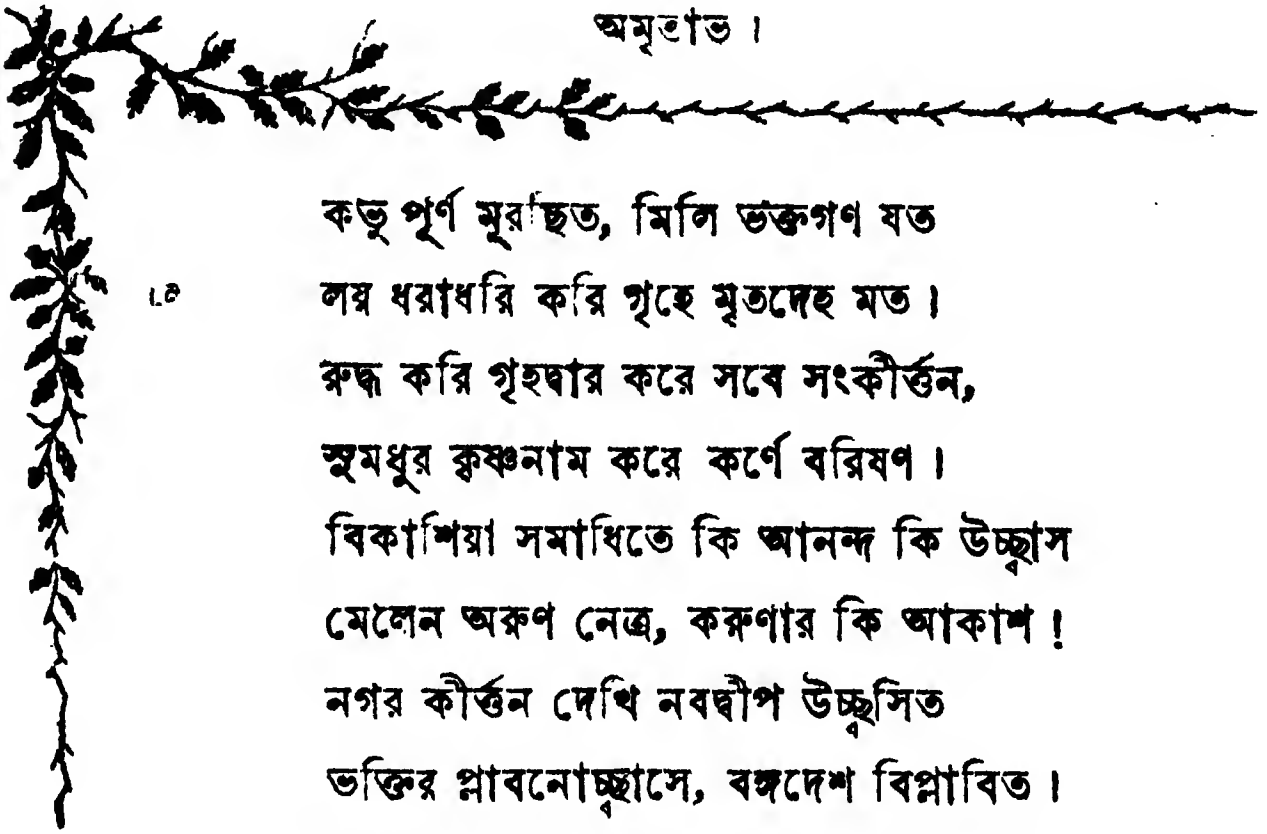




একাদশ সর্গ ।

সন্ন্যাস সঙ্কল্প ।

দিন যায়, আসে নিশি ; যায় নিশি, আসে দিন ;
মহাভাবে নিমজ্জিত, যেন সিন্ধুগর্ভে মীন,
থাকেন সতত প্রভু কিবা গৃহে কি নগরে,
নিরবধি শ্রীনয়নে অবিরল অশ্রু ঝরে ।
শুনিলেই কৃষ্ণনাম, স্বর্ণ কদলির মত
গড়েন ভূতলে প্রভু, যেন মহা বাতাহত,
কি নগরে, কি চত্বরে, জলে, স্থলে, কিবা বনে ;
সতত নিকটে থাকি রক্ষা করে ভক্তগণে ।
স্বেদ কম্প অশ্রু হাসি পুলক পুষ্পের প্রায়
বিকাশে সর্বদা, প্রভু প্রেমে গড়াগড়ি যায় ।



১০

কভু পূর্ণ মূরছিত, মিলি ভক্তগণ যত
 লয় ধরাধরি করি গৃহে মৃতদেহ মত ।
 রুদ্ধ করি গৃহদ্বার করে সবে সংকীৰ্ত্তন,
 সুমধুর কৃষ্ণনাম করে কর্ণে বরিষণ ।
 বিকাশিয়া সমাধিতে কি আনন্দ কি উচ্ছ্বাস
 মেলেন অরুণ নেত্র, করুণার কি আকাশ !
 নগর কীৰ্ত্তন দেখি নবদ্বীপ উচ্ছ্বসিত
 ভক্তির প্লাবনোচ্ছ্বাসে, বঙ্গদেশ বিপ্লাবিত ।
 গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আর
 উঠিয়াছে সংকীৰ্ত্তন, কি ভক্তির করুণার !
 গাইতেছে নর নারী, নাচিতেছে নারী নর,
 হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, আলিঙ্গিয়া পরস্পর ।
 নাহি জাতিভেদজ্ঞান, ধর্মভেদজ্ঞান আর,
 সর্বজাতি সর্বধর্ম হইয়াছে একাকার ।

অত্ৰ্যদিকে বঙ্গদেশ যাইতেছে রসাতল,
 লুপ্ত ধর্ম, অপধর্ম বর্ষিতেছে কি গরল !
 ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শুক শাস্ত্র-অত্যাচার,
 শুক যাগ বজ্র পূজা, তুলিয়াছে হাহাকার
 ব্যাপিয়া সমস্ত বঙ্গ ; জীবরক্ত পারাবার
 হইয়াছে বঙ্গভূমি,—হইতেছে অনিবার

ছাগ কবুতর শিশু লক্ষ লক্ষ বলিদান,—
 ওরে রে নির্ভর পাণী ! তাদের কি নাহি প্রাণ ?
 এমন নিরীহ হায় ! এমন দুর্বল আর,
 আছে কি জগতে কিছু ! মানবের করুণার ?
 কি নির্ভর হত্যাকাণ্ড ! জীবহত্যা কি ভীষণ !
 কি নীরব দয়া ভিক্ষা ! করুণার কি ক্রন্দন !
 হইয়াছে লুপ্তশ্রুতি,—নাহি ব্রহ্ম প্রণিধান,
 হইয়াছে অশ্বমেধ শিশুছাগ বলিদান ।
 লুপ্ত স্মৃতি,—নাহি সেই বিশাল সমাজ-ধ্যান,
 আছে মূর্থ ব্রাহ্মণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান ।
 নাস্তিক দর্শন ছয়—বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া,
 নাহি উচ্চ কর্মবাদ, বিশ্ব,—বেদান্তের ‘মায়ী’ ।
 ‘জায়’ ক্ষেত্র নবদ্বীপ ; নাস্তিক পণ্ডিত দল,
 কামিনী কাঞ্চন মাত্র জীবনের মোক্ষফল ।
 লুপ্ত তত্ত্ব, শক্তি পূজা ; নাহি দেশ-রক্ষা ব্রত ;
 হইয়াছে ‘বীরাচার’ ‘বামাচারে’ পরিণত ।
 আছে শক্তি মূর্তি মাত্র, আছে শুক পূজা আর,
 নাহি শক্তি, নাহি শাক্ত, আছে উগহাস তার ।
 নাহি আত্মবলিদান, আছে ছাগ বলিদান,
 ধর্মের মুরতি আছে, মুরতির নাহি প্রাণ ।

জাতিভেদ ধর্মভেদ, ভেদপূর্ণ কুলাচার ;
 ভেদ বিধে জর্জরিত সমাজের হাহাকার
 উঠিয়াছে চারিদিকে । ঘোরতর নির্যাতন
 সহিতেছে নিম্ন জাতি পশুবৎ নিরমম ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি চতুষ্টয়
 নাহি গুণগত, এবে জন্মগত সমুদয় ।
 মহামূর্থ, ঘোরতর পাপিষ্ঠ ও নরাধম
 ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তথাপিও সে ব্রাহ্মণ ।
 চণ্ডাল চণ্ডাল মাত্র হলেও সাধু পরম
 ছায়া তার কলুষিত, মহাপাপ পরশন !
 স্মৃতির বন্ধনে নিম্নজাতি হইতেছে জড়,
 রঘুনন্দনের স্মৃতি করিছে তা দৃঢ়তর ।
 এমন সময় আহা ! উঠিল কি সামাগান !—
 সমান সকল জীব ; কিবা হিন্দু মুসলমান !
 যথা রবি-শশী-করে, যথা মুক্ত সমীরণে
 সকলের অধিকার সমভাবে সর্বক্ষেত্রে ।
 কিবা ধনী, কিবা দীন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর,
 এই ধর্ম্যে সকলের সমভাবে অধিকার ।
 পদে ফুটে পদা ; পদা শোভে বক্ষে দেবতার ;
 পুষ্পোদ্যানে ফুটিলেও কুপুষ্প কুপুষ্পসার ।

চণ্ডাল হইলে ভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেয় ;
 অভক্ত ব্রাহ্মণ তথা চণ্ডাল হইতে হেয় ।
 নাহি চাহি যাগ, যজ্ঞ, নাহি চাহি বলিদান ;
 নাহি উচ্চ, মীচ জাতি, গাও সবে কৃষ্ণনাম ।
 কি সুন্দর, কি সরল, এ নব-ধর্ম বিধান !
 নাচ প্রেমানন্দে, গাও প্রেমানন্দে हरিনাম ।
 খোল করতাল মাত্র এ পূজার উপচার,
 মন্ত্র মাত্র हरিনাম, ভক্তি মাত্র উপহার ।
 নাহি চাহি পুরোহিত, নাহি চাহি তন্ত্রধার,
 কিবা শাস্ত্র, কি পদ্ধতি, নাহি চাহি এ পূজার ।
 এই কাক্সালের ধর্ম, কাক্সালের আশাবানী
 শুনিব ব্রাহ্মণেতর জাতি নিস্পীড়িত প্রাণী ।
 শুনিব কি সাম্য গীত ! শুনিব কি সংকীর্তন !
 দেখিল বাহিছে কিবা প্রেম ভক্তি প্রসবণ
 উদ্ধারি পতিত প্রেমে, জুড়া'য়ে তাপিত প্রাণ ;
 উঠিয়াছে কি মধুর সুনীতল हरিনাম !
 যবন हरিদাসের যবনত্ব নাহি আর !
 জগাই মাধাই মত হইল পাপী উদ্ধার !
 দেখিল কি দেবমূর্তি ! কি নেত্র, চাচর. কেশ !
 নয়নে কি প্রেমধারা ! দেবদেহে কি আবেশ !

স্মৃতির বন্ধন ছিড়ি, ব্রাহ্মণের স্বার্থজাল,
 চরণে দলিত জাতি কি প্রবাহে সুবিশাল
 ছুটিল জাহ্নবী স্রোতে নবপ্রেমধর্মে ভাসি
 দলিত পীড়িত প্রাণে পান করি সুধারাসি ।
 দেশ দেশান্তর হ'তে শত শত নর নারী,
 করে ভক্তি উপহার, নয়নে ডকতি বারি,
 আসিয়া আবেশ দেখি প্রভুর চরণে পড়ি ।
 অশ্রুতে প্রক্ষালি পদ যাইতেছে গড়াগড়ি ।
 দিবা নিশি নবদ্বীপ এই যাত্রী সমাগমে
 পরিপূর্ণ ; পরিপূর্ণ দিবা নিশি সংকোর্তনে ।
 কভু কৃষ্ণাবেশে প্রভু কঁাদে রাধা রাধা বলি ;
 কভু রাধাবেশে কঁাদি ধূলায় পড়িছে ঢলি ।
 কভু নন্দ যশোদার ভাবেতে প্রভু বিভোর ;
 কভু গোপালের তাবে নাচিছে ব্রজ কিশোর ।
 কৃষ্ণ ভাবাবেশে প্রভু কভু জপে কৃষ্ণনাম ;
 গুনিলে কৃষ্ণের নাম কভু ক্রোধে মূর্ত্তিমান
 কহেন—সে ননীচোরা, তারে বল কেবা চায় ?
 যে কহে কৃষ্ণের নাম ; তারে মারিবারে যায় ।
 'গোকুল ! গোকুল !' কভু 'বৃন্দাবন ! বৃন্দাবন !'
 'মথুরা ! মথুরা !' কভু জপিছেন অমুকুণ ।

কোন দিন পৃথিবীতে নখে কি আকৃতি আঁকি,
নির্ণিমেষ নেত্রে চাহি, শ্রীকরে শ্রীমুখ রাখি,
করেন রোদন প্রভু, ভাসে ক্রিতি অশ্রুজলে ;
জ্বলিছে হৃদয় যেন গোপীর বিরহানলে ।
এইরূপে নিশিদিন থাকেন আবেশাধীন,
দিবাকে বলেন নিশি, নিশিকে বলেন দিন ।
নাহি জ্ঞান স্থান কাল, দিবা নিশি অশ্রু ঝরে ;
আপনার গৃহ ভাবি থাকেন পরের ঘরে ।
প্রভুর আবশে কঁাদে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ
প্রভুকে বেড়িয়া, বহে অশ্রুগঙ্গা অগণন ।

একদিন ভাবাবিষ্ট জপিছেন গোপীনাম ;
আসিয়া পড়ুয়া এক কহে মূর্থ—“রাম ! রাম !
নিমাই পণ্ডিত তুমি অধঃপাতে গেলে হেন !
ছাড়ি কৃষ্ণনাম তুমি, গোপী নাম জপ কেন ?”
লাঠি লয়ে মহা ক্রোধে প্রভু মারিবারে ধায় ;
প্রাণভয়ে সে পড়ুয়া টোলে পলাইয়া যায় ।
সর্ব অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম, বহে শ্বাস ঘন ঘন,
কি হয়েছে.—সবিস্ময় জিজ্ঞাসে পড়ুয়াগণ ।
“কি জিজ্ঞাস ?”—কহে ছাত্র—“রহিল ভাগ্যে জীবন ;
পূর্ব পুরুষের পিণ্ড হইল না বিমোচন ।

নিমাই পণ্ডিত শুনি হইয়াছে অবতার,
 গেলাম দেখিতে,—দেখি ও হরি ! কি দশা তার !
 মাতালের মত বসি জপিতেছে গোপীনাম ।
 ভাল মানুষের মত আমি তারে কহিলাম—
 ‘নিমাই পণ্ডিত ! এ কি ! তোমার কি নাহি জ্ঞান ?
 ছাড়ি কৃষ্ণনাম, তুমি জপ কেন গোপীনাম ?’
 কৃষ্ণকে যে কত গালি দিল, কি কহিব আর ?
 করিল কতই নিন্দা পণ্ডিত ও পড়ুয়ার ।
 শেষে এল লাঠি নিয়ে, কাঁধে বাড়ি বলরাম ;
 বাপ ! কি প্রকাণ্ড লাঠি ! আছে আয়ু, বাঁচিলাম ।
 নবদ্বীপে ঝড়বেগে বহিল এ সমাচার ।
 ছুটিল পড়ুয়াদল, মুখে শব্দ—“মার ! মার !”
 জুটিল পণ্ডিতদল,—কিবা টিকি আন্দোলন !
 মহাঝড়বেগে যেন নড়িতেছে নলবন ।
 ক্রোধে অগ্নিমূর্তি সব মুখে শুধু—“মার ! মার !”
 কটিতে গামছাখানি আঁটিছে, খুলিছে আর ।
 কহে পঞ্চানন—“বেটা ! কলিযুগে অবতার !
 ব্রাহ্মণ মারিতে আসে, এমন শক্তি তার !”
 কহে তর্করত্ন ক্রোধে—“ভো ! ভো ! শম্মা ! দেখি চল !
 নাহি লয় কৃষ্ণনাম কিসের বৈষ্ণব বল !

কহে ঞ্চায়চুঞ্চু—“সাধে জপে গোপীনাম আর ?
 সারা রাত্রি গোপী ভজে রুদ্ধ করি গৃহদ্বার ।”
 কহে ক্রোধে শিরোমণি—“কেন বল ভয় করি ?
 আমরা কি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ নাহি ধরি ?
 তিনি মারিবেন, আর আমরা বা কেন সহি ?
 হাড়গোড় গুড়া করি, করি ফলারের দই ।”
 “তিনিত নহেন রাজা”—কহে ক্রোধে সার্বভৌম—
 “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি, আমরা কি হাড়ি ডোম ?”
 কহে স্মৃতিরত্ন হাসি—“পণ্ডিত কি বল ভায়া !
 সাত পুরুষেও তার, নাহি উপাধির ছায়া ।
 জগন্নাথ মিশ্র,—পুত্র নিমাই পণ্ডিত আর !
 সাত পুরুষেও নাই উপাধির গন্ধ তার ।
 মহা অধ্যাপক-পুত্র, নিজে অধ্যাপক সব
 আমরা পণ্ডিতগণ,—উপাধির কি গৌরব !
 ছিলেন পড়ুয়া তিনি কাল এই নদিয়ার ;
 আজি তিনি হইলেন গৌরচন্দ্র অবতার !
 খাইছেন তিনি নিত্য দধি মণ্ডা ভার ভার ;
 আমরা পণ্ডিতগণ দাঁড়াইয়া খাব মার ?
 ছয় শত শিষ্য মম, গিয়াছে আমার ছাড়ি ;
 কি আর কহিব ভায়া ! শিকায় উঠিছে হাঁড়ি ।”

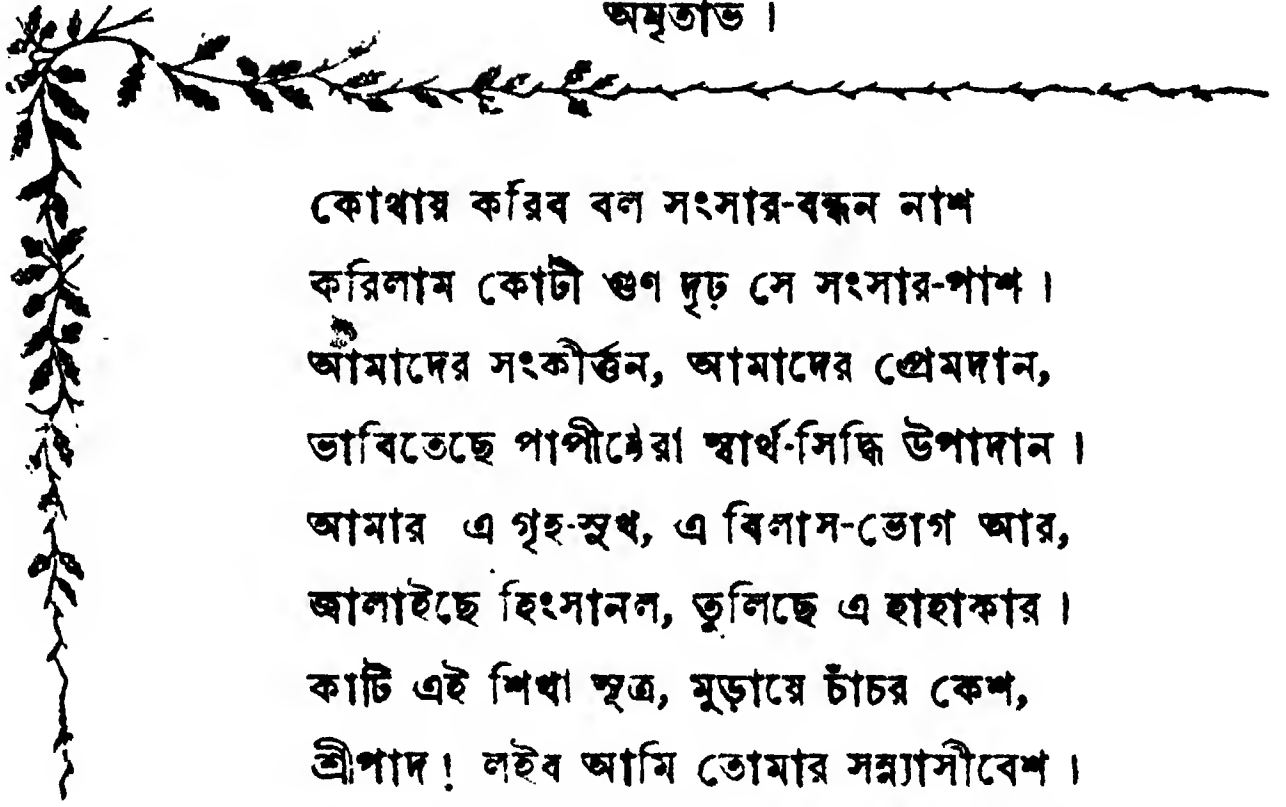
তখন পণ্ডিতদলে হ'লো মহা কোলাহল,
 শিরে করি করাঘাত, নেত্রে অশ্রু ছল ছল,
 সকলে কহিল কাঁদি—“শিষ্য কারো নাহি আর,
 নাহি ব্রত, নাহি পূজা, নাহি শ্রাদ্ধ ফলাহার,—
 কি কব হুঃখের কথা,—মুণ্ডপাত দক্ষিণার !
 ক্ষেপেছে সমস্ত দেশ ; শুধু মুখে হরি ! হরি !
 নিমাইর পদতলে দেয় শুধু গড়াগড়ি ।”
 কহে তর্করত্ন খেদে—“শিষ্য ত নাহি কাহার ;
 জাতি ধর্ম ত্রাস্কণের রহিল না দেশে আর ।
 জগাই মাধাই দুই জাতিভ্রষ্ট ছরাচার ;
 তারাও বৈষ্ণব, হৃন্দ সমাসের অবতার !
 মুসলমান হরিদাস হয়েছে এবে ঠাকুর !
 মাথায় উঠেছে এবে পথের যত কুকুর ।
 বাপ ! কাজি বেটা যেন ছিন্ন কদলির গাছ,
 পড়িল চরণতলে ;—“বিরাট কাতাল মাছ ।”—
 টলিতে টলিতে মদে আগমবাগীশ কহে,—
 “কর মহাশুদ্ধি, নহে শাক্ত থাকিবার নহে ।
 নাহি করে গুপ্ত চক্র, না থায় ‘কারণ’ আর,
 পথে ঘাটে হরি ! হরি ! সর্বজাতি একাকার !”
 ঘরপোড়া পঞ্চানন কহে—“কাজি ফাজি নহে ;

জান না পিশাচ এক নিমায়ের ঘাড়ে রয়ে ।
 না জানি হু যন্ত্রে তার আছে কি যে ইন্দ্রজাল ;
 নন্দির মাদল, আর ভূন্দির ঐ করতাল ।
 নিমে যারে দেখে, তার ঘাড়েতে পিশাচ চড়ে ;
 হরি ! হরি ! হরি ! বলি মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ।
 যার কাণে যায় ওই খোল করতাল ধ্বনি,
 মুচ্ছিত হইয়া সেও ভূতলে পড়ে অমনি ।
 দেখ না পণ্ডিত কত যাইতেছে গড়াগড়ি,
 মণ্ডা মাল্লোয়ার লোভে, তাহার চরণে পড়ি ।
 কাজি কাজি নহে ভায়া ! এস বসি এইখানে,
 বাঁধি সমাজের দল মিলি সবে দৃঢ় টানে ।”
 তখন পণ্ডিত দল গঙ্গার সৈকতে বসি,
 শকুণের পাল মত, বাঁধিল সমাজ কসি ।
 নশ্র নাকে গুজি কেহ, কেহবা গুরু টানে ;
 রহিল বসিয়া সবে কিছুক্ষণ মহাধ্যানে ।
 হৃদয়বুদ্ধি পঞ্চানন, হাতে নশ্র কহে—“দেখ !
 এই গঙ্গাতীরে বসি এ ব্যবস্থা সবে লেখ ।
 মার জাতি নিমাইয়ের, হরিবোলাদের আর,
 বন্ধ কর হুকা জল, ক্রিয়া কৰ্ম লোকাচার ।
 বন্ধ কর ... বকে, পুত্র কন্যাদের বিয়া,

বন্ধ কর মড়াপোড়া, মরে যেন মড়া নিয়া ।
 কি আর কহিব ভায়া ! এমন বাঁধরে ধরা,
 হয় যেন শচী বুড়ী একেবারে বাসিমড়া ।
 পড়ুয়া ত আমাদের সহস্র সহস্র আছে ;
 ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’ ;—দেখি কোন বেটা বাঁচে ।
 বন্ধ কর পথ ঘাট, মার যারে যথা পাও ;
 দই মণ্ডা লুচি পথে সকলে লুটিয়া খাও ।
 বউ ঝি ও শালাদের রেতে টেনে কর বার ;
 ধরি গৌর-অবতার, পথে চূর্ণ কর হাড় ।
 গোপনে শচীর কর অপমৃত্যু সংঘটন ;
 বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া,—কুস্বিনী কর হরণ ।
 চালাও অগ্নিপুৰাণ বৈদিক গোমেধ কর,
 রক্ষা কর হিন্দু ধর্ম,—এই পরামর্শ ধর !”
 খামিলেন পঞ্চানন, কহিলা পণ্ডিতগণ,—
 “ঠিক কথা ; ধর্মরক্ষা, জাতিরক্ষা প্রয়োজন ।”
 উঠিল কি দেশব্যাপী ঘোরতর কোলাহল,
 জলিল ভীষণ বেগে সামাজিক দাবানল ।

* কেহ যদি এ চিত্র অতিরঞ্জিত ও অযথা নিন্দা মনে করেন, তবে আমি বলিব যে আমি নিজে ইহার ভুক্তভোগী । ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এরূপ অধঃপতন না হইলে, ভারতের এ অধঃপতন ঘটিত না ।

আসি ভক্ত দলে দলে কহে করি হাহাকার—
 “হায় প্রভু ! ভক্তগণে রক্ষা কর এইবার !”
 শুনি কহিলেন প্রভু, হাসি উচ্চহাসি তবে—
 “প্রহ্লাদের মত রক্ষা করিবেন হরি সবে ।
 করিহু পিপ্ললিখণ্ড, হবে কফ নিবারণ ;
 উলটিয়া কফ আরো বাড়িল যে বিলক্ষণ !”
 ক্ষণেক নীরব রহি, নিত্যানন্দ-করে ধরি,—
 বসি নিরঞ্জে প্রভু কহিলেন—“হরি ! হরি !—
 ত্রীপাদ ! কোথায় প্রেমে ভাসাইব ধরাতল,
 জালিল বিদ্বৈষ বিষ এই হিংসা দাবানল !
 ভাবিলাম শুনি গুরু-সংকীৰ্ত্তনে হরিনাম,
 নিবে হরিনাম জীবে, পাবে পাপী পরিভ্রাণ ।
 এই মহা মরুভূমে হবে গঙ্গা প্রবাহিত
 হইল নিষ্ফল আশা, হইলাম কলঙ্কিত ।
 বিলাইলে হবিনাম নবদ্বীপে ঘরে ঘরে
 নগর-কীৰ্ত্তনে প্রেমে ভাসাইলে নারী-নরে,
 অধর্ম পাষণ্ড তবু দ্রবিল না হায় ! হরি !
 তুলিল মস্তক আরো ভীষণ মুরতি ধরি ।
 কোথায় করিব বল আমরা জীব উদ্ধার,
 করিতেছি হায় দেখ আমরা জীব সংহার ।



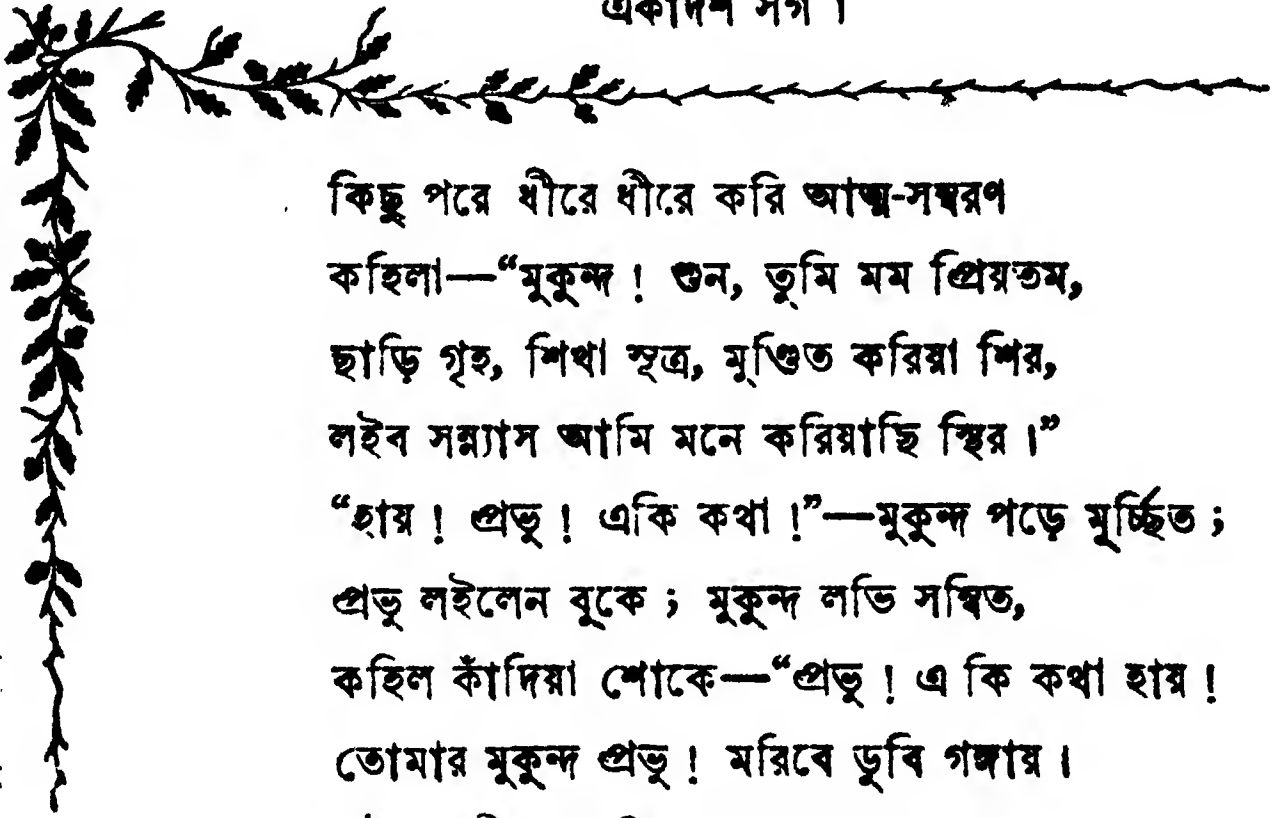
কোথায় করিব বল সংসার-বন্ধন নাশ
 করিলাম কোটী গুণ দূর সে সংসার-পাশ ।
 আমাদের সংকীৰ্ত্তন, আমাদের প্রেমদান,
 ভাবিতেছে পাপীশেরা স্বার্থ-সিদ্ধি উপাদান ।
 আমার এ গৃহ-সুখ, এ বিলাস-ভোগ আর,
 জ্বলাইছে হিংসানল, তুলিছে এ হাহাকার ।
 কাটি এই শিখা সূত্র, মুড়িয়ে চাঁচর কেশ,
 ত্রীপাদ ! লইব আমি তোমার সন্ন্যাসীবেশ ।
 বাহারা আমাকে দেব ! চাহিতেছে মারিবারে,
 বেড়াইব ভিক্ষা করি তাহাদের দ্বারে দ্বারে ।
 সন্ন্যাস লইলে আমি, লবে জীব হরিনাম ;
 সন্ন্যাসীকে হিংসা নাহি করে কেহ, ভগবান্ !
 করেছি সঙ্কল্প আমি ছাড়িব গৃহ নিশ্চয়,
 দেহ বিধি, করিও না কাতর তব হৃদয় ।
 শাস্ত্রের শৃঙ্খল শত, স্মৃতির বন্ধন আর,
 বেদান্তের মায়াবাদ, তান্ত্রিকের পাপাচার,
 ভক্তিশূন্য যাগ যজ্ঞ, জীবহিংসা অনিবার,
 অধর্ম ধর্মের স্থান করিয়াছে অধিকার ।
 অগত উদ্ধার দেব চাহি যদি সাধিবার,
 দেও আশা ! যাই চলি ; নবদোষে কার্য আর

নাহি আমাদের ; শুন হঃখার্ণবে হাহাকার
করিছে অনন্ত জীব, চল যাই করি পূর ।
কি ছার সংসার-সুখ ! নিরন্তর বিষগান ;
অনন্ত জীবের হঃখে নিরন্তর কাঁদে প্রাণ ।
যেই প্রেম-গঙ্গা আজি নবদীপে প্রবাহিত,
চল যাই করি তাহা সিদ্ধুসহ সম্মিলিত,
প্লাবিতা ভারতভূমি, প্লাবি এই ধরাতল ;
চল যাই তাপদগ্ধ করি জীব সুশীতল ।
বহিতেছে দুই নেত্রে জীব-করুণার ধারা,
জীব-করুণায় প্রভু উদ্বেলিত আত্মহারা ।

নিত্যানন্দ প্রভু শিরে হায় ! যেন অকস্মাৎ
হইল বিকট শব্দে ভীষণ অশনিপাত ।
দূরে গেল চপলতা, হইলা নিতাই স্থির,
বারিপূর্ণ মেঘ মত হইল মুখ গম্ভীর ।
ক্ষণেক নীরব রহি, করি আত্ম সম্বরণ,
কহিলা নিতাই ধীরে, শোকে উদ্বেলিত মন,—
আসন্ন ঝটিকা শাস্ত—“প্রভু ! তুমি ইচ্ছাময় ;
যাহা ওব ইচ্ছা, তুমি করিবে তাহা নিশ্চয় ।

বিধি বা নিষেধ বল কে তোমাতে দিতে পারে ?
 বালির বন্ধন পারে রোধিতে কি পারাবারে ?
 ভাল মন্দ সকলই নহে তব অবিদিত,
 সেই সত্য বাহা তব হৃদয়েতে প্রতিষ্ঠিত ।
 তুমি জান বেই রূপে করিবে জীব উদ্ধার ;
 কে জানে বর্ষিতে বারি . বারিধর বিনা আর ?
 কহ তব ভক্তগণে ; হায় ! প্রভু অকস্মাৎ
 করিও না তাহাদের হৃদয়েতে বজ্রাঘাত ।
 কহ প্রভু ! শচীমাকে—“বাল্লক্ক কণ্ঠস্বর ;
 হৃদয় উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, করে অশ্রু দর দর ;—
 “অভাগিনী শচীমাতা ! অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া !”
 সরিল না কথা আর, বিদীর্ণ হইল হিয়া ।
 উভয়ে নিভৃতে বসি অধোমুখে বহুক্ষণ,
 করিলেন অশ্রুধারা অবিরল বরিষণ ।

মুছি অশ্রু, গেলা প্রভু মুকুন্দ-গৃহে বিভোর,
 দেখি প্রভু মুকুন্দের আনন্দের নাহি ওর ।
 প্রভু কহে—“গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল গীত ।”
 গাইল মুকুন্দ,—কণ্ঠ কি প্রেম-সুধা পূরিত !
 হুকারিয়া বাহ তুলি নাচে “বোল বোল” করি,
 আশ্বহারা মুকুন্দের কখন গলায় ধরি ।



কিছু পরে ধীরে ধীরে করি আশ্র-সম্বরণ
 কহিলা—“মুকুন্দ ! তুমি মম প্রিয়তম,
 ছাড়ি গৃহ, শিখা স্ত্র, মুণ্ডিত করিয়া শির,
 লইব সন্ন্যাস আমি মনে করিয়াছি স্থির ।”
 “হায় ! প্রভু ! একি কথা !”—মুকুন্দ পড়ে মুচ্ছিত ;
 প্রভু লইলেন বুকে ; মুকুন্দ লভি সম্বিত,
 কহিল কাঁদিয়া শোকে—“প্রভু ! এ কি কথা হায় !
 তোমার মুকুন্দ প্রভু ! মরিবে ডুবি গঙ্গায় ।
 এই নবদ্বীপ আজি নব বৃন্দাবন ধাম ;
 পুষ্পাকীর্ণ কুঞ্জবন ক’রো না মহা আশান !
 এ সুন্দর নাট্যশালা ; এই সুমধুর গান ;
 ভাঙ্গিও না হায় ! প্রভু ! ক’রো না মহা আশান !
 বহিছে এ প্রেমগঙ্গা জুড়ারে পতিত প্রাণ,
 হায় ! করিও না শুষ্ক, করিও না মরুস্থান ।
 নিতান্ত যাইবে যদি, কিছু দিন থাকি আর,
 জুড়াও কীর্তনে জীব, পতিত কর উদ্ধার ।
 ভগীরথ অমুসরি আসিলেন ভাগীরথী,
 আসিল পদাঙ্কে তব এই প্রেম স্রোতস্বতী ।
 এ পতিত বঙ্গভূমি না হ’তে প্রভু ! উদ্ধার,
 কোথায় লইয়া যাবে এ প্রেমগঙ্গা তোমার ?

ব্রজ গোপীদের হৃৎখে নিরন্তর কঁাদ তুমি ;
তুমি কি করিবে ব্রজ কৃষ্ণশূণ্য ব্রজভূমি ?
হার প্রভু ! হরিও না মুকুন্দের কণ্ঠস্বর ;
হরিও না প্রাণ তার রাখি এই কলেবর ।
তোমার করে বঁশী ভাঙিবে কি তুমি হার !
ভাঙ্গ তবে !”—মূর্ছিত মুকুন্দ পড়িল পায় !

মুকুন্দে করিয়া শান্ত, মুছিয়া নয়ন নীর,
চলিলেন গদাধর গৃহে প্রভু শান্ত স্থির ।
কহিলেন—“শিখা সূত্র ঘুচাইয়া, গদাধর !
হইব্ সন্ন্যাসী আমি ।”—ক্লান্ত হ’ল কণ্ঠস্বর ।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি বজ্রাহত গদাধর
কহে—“প্রভু ! এ কি কথা ! অদ্ভুত বিস্ময়কর !
শিখা সূত্র ঘুচাইলে মাত্র যদি কৃষ্ণ পাঠ,
গৃহাশ্রমে তব মতে তবে কি বৈষ্ণব নাট ?
তোমার এ মত প্রভু ! শাস্ত্র মত জ্ঞান নয় ;
গৃহাশ্রম শ্রেষ্ঠাশ্রম সর্ব ধর্মশাস্ত্র কয় ।
তুমিহঁত সংকীর্ণনে প্রকাশিলে ব্রজ-লীলা ;
তুমিহঁত ব্রজ-প্রেমে তরল করিলে শিলা ।
ব্রজ-প্রেম নহে প্রভু ! শুধু প্রেম সন্ন্যাসীর ;
সন্ন্যাসীর প্রেম নহে প্রেমময়ী শ্রীমতীর ।

সন্ন্যাসীর নাহি পুত্র, নাহি পিতা মাতা আর,
 নাহি পত্নী, নাহি প্রভু, মরুময় এ সংসার ।
 সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী, কেমনে পাইবে তারা
 শান্ত, দান্ত, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ধারা ?
 হায় ! প্রভু হেন কথা আনিও না মুখে আর ;
 তোমার এ প্রেম হাট ভাঙ্গিও না নদীয়ার ।
 এখনোত জীবগণ হয় নি প্রভু ! উদ্ধার ;
 তুলিও না বোধনাস্তে বিজয়ার হাহাকার ।
 শিরিশ কুসুম দেহ, এ নব যৌবন তব ;
 সন্ন্যাস লইলে তুমি, পাষণ হইবে দ্রব ।
 এখনো বালক তুমি, কঠোর সন্ন্যাস ব্রত,
 কেমনে কোমল অঙ্গে সহিবে পাষণবৎ ?
 মরিবে ভকতগণ, মরিবে জননী আর,
 হায় ! সে বালিকা বধূ, কি দশা হইবে তার ?—
 নিমাইরে লয়ে বুকে, শোকোন্মত্ত গদাধর
 কঁাদিতে লাগিল উচ্ছে, কঁাদিলেন বিশ্বস্তর ।
 বহিল বিছাৎবেগে এই শোক সমাচার,
 ছুটিল বিছাদাহত ভক্ত করি হাহাকার ।
 আসি গদাধর গৃহে, প্রভুর চরণে পড়ি
 কেহ বা মূর্ছিত, কেহ দেয় কঁাদি গড়াগড়ি ।

কেহ কহে—“এ কুঞ্চিত চাঁচর চিকুর জাল,
 ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি বিছাতের অন্তরাল,
 না পারিলে সাজাইতে সুবাসিত পুষ্পদামে,
 তোমার এ ভক্ত প্রভু ! নিশ্চয় মরিবে প্রাণে ।”
 কেহ কহে কাঁদি উচ্ছে—“এ সুদীর্ঘ কেশভার
 অমলকি দিয়া যদি নাহি করি পরিষ্কার,
 সুরভি পুষ্পের তৈলে নাহি করি সুবাসিত,
 না বাধি মোহনচূড়া,—মরিব প্রভু ! নিশ্চিত ।”
 শিরে করি করাঘাত কেহ করে হাহাকার—
 “চন্দন তিলক নাহি ললাটে দেখিলে আর,
 না দেখি শ্রীঅঙ্গ তব চর্চিত চন্দন রাগে,
 হায় ! প্রভু এই প্রাণ ত্যজিব তোমার আগে ।”
 কেহ কাঁদে—“হায় ! প্রভু ! এ কি নির্দয়তা ঘোর !
 ছাড়ি চাক ‘কৃষ্ণকেলী,’ পরিবে কোপীন ডোর !
 ভিখারি হইবে তুমি করক লইয়া হাতে !—
 বধিও না ভক্তগণে এইরূপ বজ্রাঘাতে ।
 মাতৃহত্যা, পত্নীহত্যা,—এখনো বালিকা হায় !—
 করিও না ;—ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায় ।
 তুমি গৃহ ছাড়, গৃহ ছাড়িব আমরা সবে ।
 বঙ্গদেশে নরনারী কেহ নাহি গৃহে রবে ।

সন্ন্যাস লইলে তুমি পাষণ হইবে জব,
 করুণা সাগর তুমি, কলঙ্ক হইবে তব ।
 লুপ্ত হবে হরিনাম, উঠিবে কি হাহাকার,
 শোকে, ক্রোধে, হরিনাম কেহ না লইবে আর ।
 উঠিবে রোদন ধ্বনি, রুদ্ধ হবে সংকীর্ণন ;
 হবে মহাবন প্রভু ! তব এই বৃন্দাবন ।
 পতিত-উদ্ধার-ব্রত, তোমার হবে নিষ্ফল ;
 শুকাইবে প্রেমনদী, বহিবে নয়ন জল ।”
 ভক্তের রোদনে প্রভু হইলেন বিচলিত,
 করুণ নয়নে বহে দর অশ্রু বিগলিত ।
 তুলি অবনত মুখ, সুধাসিক্ত শতদল,
 কহিলা করুণাময়, মুছি করে অশ্রুজল,—
 “কেন এই হাহাকার ? জানেন অন্তরবামী,
 লোক-শিক্ষা তরে মাত্র সন্ন্যাস করিব আমি ।
 সন্ন্যাস লইয়া আমি, তোমরা কি ভাব মনে,
 তোমাদের ছাড়ি আমি বেড়াইব বনে বনে ?
 এ প্রেমবন্ধন হায় ! তোমাদের কাটি বলে,
 পাব কৃষ্ণপ্রেম আমি, কোন তপস্তার ফলে ?
 ত্যজ এই কাতরতা, এই চিন্তা অকারণ ;
 তোমরা যেখানে রবে, আমি তথা সর্বক্ষণ ।

নহে এ জনম মাত্র, যেন জন্ম জন্মান্তর,
তোমাদের প্রেম-সঙ্গ পাই আমি নিরন্তর ।
শ্রীকৃষ্ণ করুন কৃপা,—যেন তোমাদের সঙ্গে
জন্মে জন্মে থাকি আমি এই সংকীর্ণ রঙ্গে ।”
প্রেম ভরে সকলেরে দিলা প্রভু আলিঙ্গন ;
প্রবোধ মানিলা সবে,—হার ! মরীচিকা-ভ্রম !





দ্বাদশ সর্গ ।

বিদায় ।

আপন কুটারে বসিয়া পূজায়,
শচীমা আছেন ধ্যানে ।

“মা ! মা ! মা !” ডাকিয়া নিমাই
আসিলেন সেই খানে ।

ষাটিবর্ষ সাত বৃদ্ধা জননীর
গুল্ল দীর্ঘ কেশ তার

পড়েছে আসনে আবারিয়া দেহ
গজার ধারা তুষার ।

এ বৃদ্ধ বয়স তথাপি মায়ের
দীর্ঘ দেবী-দেহ কিবা
মধ্যাহ্ন কিরণে বলসিছে আঁখি !
আলোকিত করি দিবা ।
দীর্ঘল নিটোল বদন মণ্ডল
দীর্ঘল যুগল মুদিত আঁখি ;
সমুন্নত গ্রীবা, সমুন্নত দেহ,
পদ্মাসন অঙ্কে কর-পদ্ম রাখি ।
বিত্ততির রেখা কুঞ্চিত ললাটে
ঈষদ কুঞ্চিত বক্ষে বাহুদ্বয়,
ভক্তির প্রতিমা বসিয়া জননী—
সর্ব অঙ্গ স্নেহ কোমলতাময় ।
শোভে গুল্ল শিরে রুদ্রাক্ষের মালা,
রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে বাহু মূলে ।
শোভিছে প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ;
অগ্রে পুষ্প-পাত্র পরিপূর্ণ ফুলে ।
রজত আধারে চন্দনে চর্চিত
শোভে শালগ্রাম স্তূপোল স্তূপ ;
দীপাধারে দীপ ; ধূপদানে ধূপ ;
অলিছে বিত্তরি গন্ধ মনোহর ।

কি মহিমা অঙ্গে, অঙ্গ-ভঙ্গিমায়,
কি মহিমা শুভ্র কেশে মুখে রয় !
কিবা পবিত্রতা মিশি মহিমায়;
করিয়াছ কক্ষ পবিত্রতাময় !

মুহূর্ত্ত নিমাই চিত্তিতের মত
সেই দেবী-মূর্ত্তি রহিল চাহি ;
উচ্ছসিত হই মাতৃপ্রেম ধারা,
পড়িতে লাগিল কপোল বাহি ।
“মা ! মা !” সম্ভাষণ শুনিয়া জননী
নিমিলিত নেত্র মেলিলা স্নুখে ।
নিতে পদধূলি আলিঙ্গিয়া পুত্রে
লইলেন মাতা আদরে বুকে ।
“এস ! বাপ এস !”— কহিলা জননী—
“করুন শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণ তোমার !
এ কি কথা লোকে করে কাণাকানি
তুমি গৃহে বাপ ! রবে না আর ।
বিধ্বংস বাপ ! ছাড়িল যে দিন
মরিলা সে দিন জননী তোমার ।

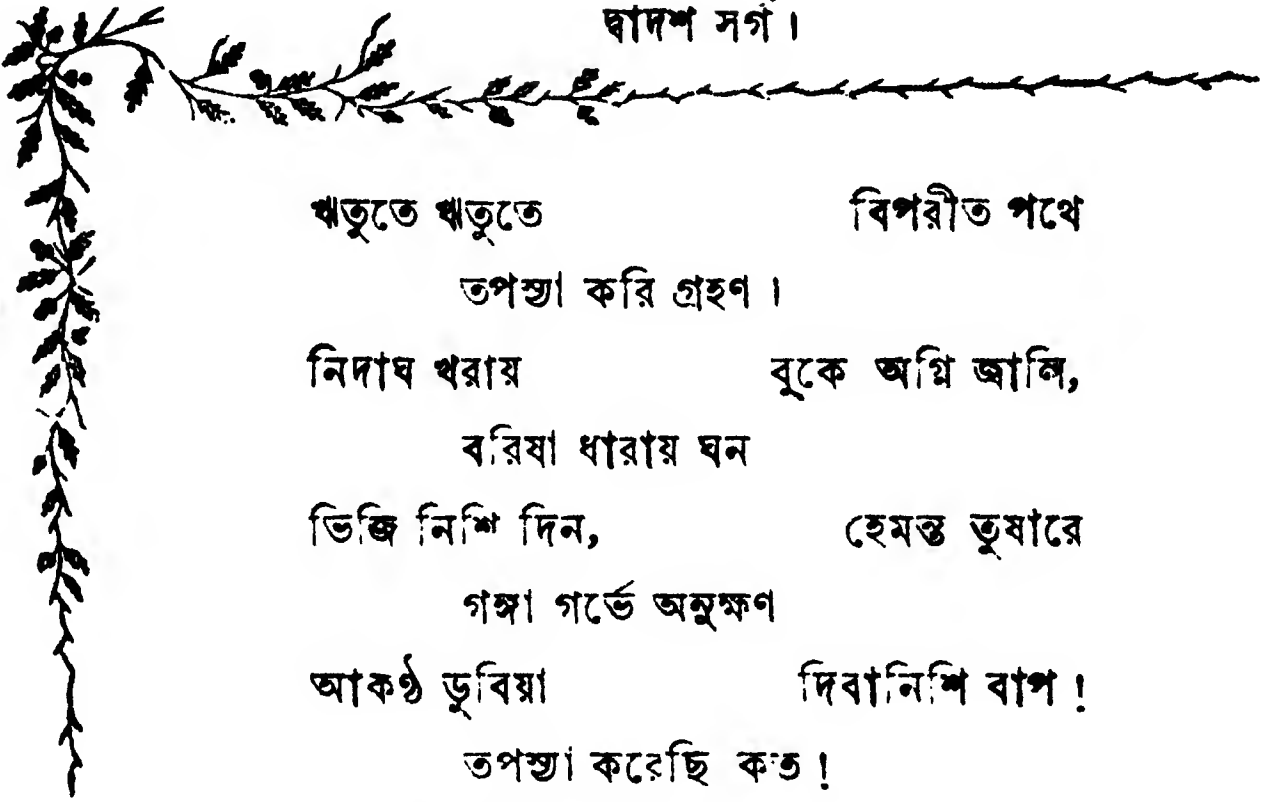
শোকের উপরে স'ব কত শোক ?
 তুমি কি মড়াকে মারিবে আবার ?
 সন্ন্যাসী দেখিলে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
 সন্ন্যাস—এ শব্দ শুনিলে আর,
 কাঁপি থর থর ; বজ্রপাত মত
 লাগে বাপ ! উহা শ্রবণে আমার ।
 না—না বাপ ! না—না, মাথা খাও মোর,
 হেন কথা মুখে কভু না আনিও ।
 অভাগিনী মাতা মরিলে তোমার,
 তবে বাপ ! তুমি বোগী হ'য়ে যেরো !”

অবনত মুখে রহিলা নিমাই,
 মুখে নাহি কথা সরে ।
 বাপকরু কণ্ঠ কি দারুণ ঝড়
 বহিছে অন্তরাস্তরে ।
 আবার জননী কহিলা কাতরে,—
 “দয়া তব সর্বজীবে ।
 নিমাই ! কেবল নিজ জনে তব
 একপে কি ছঃখ দিবে ?

অমৃতভ ।

মা ! তুমি এমন হইলে কাতর,
হ'লে এত মন্দ্রাহত,
না দিলে বিদায় প্রসন্ন বদনে
নিব না সন্ন্যাসব্রত ।”

“নিমাই ! নিমাই !”— কাদিয়া জননী
কহিলা করুণ স্বরে,—
“মা হইয়া তোরে করিব সন্ন্যাসী
সাক্ষাৎ আপন করে ।
প্রসন্ন বদনে হইতে সন্ন্যাসী
পুত্রেরে দিতে বিদায়,
পারে কি জননী ? এমন পাষাণী
আছে কি জগতে হয় !
নয়টি সন্তান একে একে একে,
হারায়ে পাষাণী আমি,
আছিরাে বাঁচিয়া নিমাইরে ! তোর
দেখি চাঁদ মুখখানি ।
কি যে তপস্যায় পাইয়াছি তোরে,
ওরে তপস্যার ধন !



ঋতুতে ঋতুতে বিপরীত পথে
 তপস্তা করি গ্রহণ ।
 নিদাঘ ধরায় বুকে অগ্নি জ্বালি,
 বরিষা ধারায় ঘন
 ভিজি নিশি দিন, হেমন্ত তুষারে
 গঙ্গা গর্ভে অনুক্ষণ
 আকণ্ঠ ডুবিয়া দিবানিশি বাপ !
 তপস্তা করেছি কত !
 দ্বাদশ মাসেতে করি উপবাস
 করেছি দ্বাদশ ব্রত ।
 ত্রয়োদশ মাস ধরি গর্ভে তোরে
 পাইয়া কতই ক্লেশ !
 পাইয়াছি তোরে নিমাই আমার,
 এই দেহ করি শেষ ।
 ত্রয়োদশ মাস সাজিয়া যোগিনী,
 শিরে কেশ জটা ভার,
 ত্রয়োদশ মাস জপি হরিনাম,
 করিয়া অমু আহার,
 পাইয়াছি তোরে নিমাই আমার ;
 তুই কি আমারে ছাড়ি

অমৃতভ ।

করিবি সম্মাস,

অকরুণ প্রাণে

এরূপে মড়াকে মারি ?

* * * * *

* * * * *



